সুরবালা

বা

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রভাব।

(গার্হস্থ্য উপন্যাস)

শ্রীচন্দ্রশেখর কর-প্রণীত।

এ, কে, রায় এণ্ড কো—কলিকাতা

১৩০৮।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

Calcutta.

Printed by S. Bhattacharya, at the
Metcalfe Press,
54, Gour Mohon Mukherji's Street.

Published by A. K. Roy & Co.
57/1 College Street.

1901.

মনুষ্যকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার যুবক বৃদ্ধ যে কেহ বাজিৎপুরের নাম শুনিয়াছে, বাজিৎপুরের কথা উঠিলে সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবে, "সেই যদুঘোষের বাজিৎপুর?" আমরা দিনান্তের পথের কথা বলিয়াছি; এখনকার হিসাবে বলিতে হইলে দশ এগার ক্রোশ বা কুড়ি বাইশ মাইল বলিতাম। যদুপতির সময়ে এ হিসাব প্রচলিত ছিল না। তখন কলিকাতা হইতে কাশী কিম্বা দিল্লীর দূরত্ব বুঝাইতে হইলেও লোকে এত দিনের বা এত মাসের পথ বলিত। কারণ সহজেই অনুমিত হইবে। সে সময়ে লোকের গতিবিধি প্রায় পদব্রজেই সম্পন্ন হইত। অধুনা লৌহপথে দেশ আচ্ছাদিত। বাষ্পীয় শকটে গমনাগমনের দক্ষিণা আবার ক্রোশ হিসাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে। আট পয়সার এক সামান্য পাঁজি কিনিলে তাহাতে দেখিতে পাইবে, প্রয়োজনীয় তিথি নক্ষত্র শুদ্ধরূপে লিখিত না থাকিলেও, এক দিকে হাবড়া, বালি, কোন্নগর, অন্য দিকে শিয়ালদহ, দমদমা, বেলঘরিয়া বা বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া প্রভৃতি স্থানের দূরত্ব এবং ভাড়া নির্ভুলরূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ক্রোশ বলিতে আর ভাবনা কি? যদুপতি কিসে পরিচিত, তাহা বলা হয় নাই। পাঠক অবশ্যই অনুমান করিয়াছেন, সদ্‌গুণ তাঁহার প্রসিদ্ধির হেতু। যদুপতি একজন সে কালের নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার ভক্তি ছিল। যদুপতি জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, পরহিতব্রত এবং অতিশয় অতিথি-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার বিভব যেমন ছিল, ব্যয়ও তেমনই ছিল। দানই যে অর্থের

একমাত্র ব্যবহার, ইহা তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নিয়ম ছিল যে, বাড়ীতে অতিথি আহার না করিলে যদুপতি নিজে জলগ্রহণ করিতেন না। অথচ এক দিনও তাঁহাকে উপবাসী থাকিতে হয় নাই। বাজিৎপুরে যাত্রী কিম্বা পথিক যে কেহ আসিতেন, তাঁহাকে যদুপতির আতিথ্য গ্রহণ করিতেই হইত। অধিক সময়ক্ষেপ হইবে বলিয়া যাঁহারা তাঁহার ভবনে যাইতে অনিচ্ছুক হইতেন, তাঁহাদের নিমিত্ত পথিপার্শ্বেই সর্ব্ব-প্রকার আহার্য্য বস্তুর এক বিপণি সজ্জিত থাকিত। অতিথির ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া বিপণিকারি যদুপতির নিকট হইতে ভুক্ত দ্রব্যের মূল্য গ্রহণ করিত। প্রবাদ আছে যে, একবার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে যদুপতির ভবনে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়। খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক দিন ধরিয়া অবিরাম বৃষ্টি হওয়ায় রন্ধনের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠের অভাব হইয়া উঠে। যদুপতি অম্লান-বদনে আপন আলয়ের কতকগুলি মূল্যবান কাঁচা ঘর ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে তৃণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং সহর্ষে কহিয়াছিলেন, ঘর আমি আবার পাইব, কিন্তু এমন অতিথিসমাগম আর হইবে না!

আমরা এ স্থলে যদুপতি সম্বন্ধে আর একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। সেটি তাঁহার প্রবল ভক্তি বিশ্বাসের পরিচায়ক। যদুপতি সপ্তনবতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। এই দীর্ঘজীবনের শেষ সময় পর্য্যন্তও তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়শক্তির



দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূচনা।



ভবতারণ যদুপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণের একমাত্র সন্তান। কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণেরও একই পুত্র; তাঁহার নাম প্রেমচাঁদ। যদুপতি যে পরলোকগত, ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র রাজকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণও ইহলোকে নাই। রাজকৃষ্ণের স্ত্রীরও কাল হইয়াছে। প্রেমচাঁদের বৃদ্ধা জননী কিন্তু আজিও জীবিতা। প্রেমচাঁদ নিজেই পঞ্চাশের কাছাকাছি গিয়াছেন। ভবতারণ পঞ্চাশ পার হইয়াছেন। উপন্যাসের সম্পর্ক অবশ্য ইঁহাদের অথবা ইঁহাদের পুত্রকন্যাদির সঙ্গে। আমরা কেবল ইঁহাদের বংশের পরিচয় দিবার নিমিত্ত প্রথম অধ্যায়ে যদুপতির জীবনের কয়েকটি কথা বলিয়াছি। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী-কুলে যাঁহাদের জন্ম, বংশমর্য্যাদা বুঝাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের

কি আছে? কোন ইংরেজের কথা হইলে, বলিয়া দিতাম যে, তাহার উর্দ্ধতন পঞ্চবিংশ পুরুষ খৃষ্টীয় সহস্রাধিক ষট্‌ষষ্টি অব্দে বিজেতা উইলিয়মের সহিত ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া দ্বীপমৃত্তিকা পবিত্র করিয়াছিলেন। আমরা বাঙ্গালী—আমাদের কীর্ত্তিমান পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম অনেক দিন ডুবিয়া গিয়াছে। এখন আমরা কি দিয়া কুলগৌরব প্রতিপন্ন করিব? আক্ষেপের বিষয় এই যে, এখন আমাদিগকে বংশের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে বলিতে হয় যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নবাবসরকারে কর্ম্ম করিতেন, বা আমাদের বাদসাহী জায়গীর আছে, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ আমাদের গৌরবের পরিচয় অন্যবিধ। হিন্দুসমাজ বৃদ্ধ সমাজ। ইহার বাল্যস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। যৌবনকথাও সম্যক্ স্মরণ নাই। এ সমাজ এতই বৃদ্ধ যে, পৃথিবীতে এত বয়সের আর কোন সমাজই জীবিত নাই। ইহার যখন শৈশব কাল, তখন ত জগতে অন্য জাতির জন্মই হয় নাই। যৌবনসময়ে সমগ্র পৃথিবীতে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না। প্রৌঢ়াবস্থায় যৌবনমদদৃপ্ত যাহাদের সহিত ইহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, সে গ্রীক্, পারসীক প্রভৃতি জাতি তনুত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। রোম, মিসর, কার্থেজ ইত্যাদি যাহারা দূর হইতে ইহার উন্নতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহারা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ হিন্দুসমাজ কিন্তু এখনও এমন ভাবে রহিয়াছে যে, ইহার মৃত্যু কবে হইবে, কেহই বলিতে পারে না। ইহার

ভবতারণ এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র প্রেমচাঁদ, ইহাঁরাও ঘোষ বংশের সুসন্তান বটেন। তাঁহারা উভয়ে একান্নে পৈতৃক ভবনে বাস করিতেছেন। পরস্পরে সদ্ভাব প্রীতি এতই অধিক যে, সচরাচর সহোদরদ্বয়েও তেমন দৃষ্ট হয় না। লোকে ইহার দুই কারণ বলিয়া থাকে। এক তাঁহাদের উভয়ের সৎস্বভাব, আর প্রেমচাঁদের অপত্যহীনতা। ভবতারণের দুই পুত্র ও এক কন্যা। প্রেমচাঁদের পুত্র, কন্যা কিছুই হয় নাই। সন্তান হইল না বলিয়া প্রেমচাঁদের মাতা দুই বার তাঁহার বিবাহ দেন। প্রথম বধূ পরলোকগতা। দ্বিতীয়া সন্তানপ্রসবের স্বাভাবিক বয়স অতিক্রম করিলে বৃদ্ধা পুত্রকে আর একবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রেমচাঁদ কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনি বুঝাইতেন, মা, সন্তান ত বংশরক্ষার নিমিত্ত। দাদার ছেলেরা বেঁচে থাকলেই বংশরক্ষা হইবে।

ভবতারণ বার মাস বাড়ীতেই থাকেন। প্রেমচাঁদ অধিকাংশ সময় এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। দান এবং অতিথিসৎকার প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রবল। এক জন যেন বাহির হইতে অতিথি আর্ত্ত প্রভৃতি দানের পাত্র কুড়াইয়া আনেন, আর এক জন বাড়ীতে বসিয়া তাহাদের সেবা ও সৎকার করেন। উভয়ের অন্তঃকরণ এতই নির্ম্মল এবং পরস্পরের প্রীতি এতই অধিক যে, দানের নামে এক জন সমস্ত সংসারটি ধরিয়া দিলেও অন্যে সন্তুষ্ট বই বিরক্ত হন না। একবার দুর্ভিক্ষ সময়ে বাজিৎপুরের চতুষ্পার্শ্বস্থ অনেকগুলি গ্রামের লোক অন্নাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিল।

ঘোষেদের গোলায় সে বার অধিক ধান্য ছিল না। প্রেমচাঁদ দেখিলেন, কোন এক কৃপণ মহাজনের ঘরে প্রচুর ধান্য সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু লোকের দুরবস্থা দেখিয়া সে তাহা কাহাকেও ঋণ দিতে সম্মত নহে; অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। প্রেমচাঁদ ভবতারণকে কহিলেন, "দাদা এত মূল্যে কেহই ধান্য ক্রয় করিতে পারিবে না। আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমরা সমস্ত ধান্য কিনিয়া লই, এবং লোককে বিলাই। লোকের অবস্থা ভাল হইলে আপনা হইতেই শোধ করিবে। এক জনের গৃহে অন্ন সঞ্চিত থাকিতে অসংখ্য লোক আহারাভাবে প্রাণ হারাইবে, ইহা অসহ্য। ভবতারণ হৃষ্টান্তঃকরণে নগদ টাকা যাহা কিছু ছিল, তাহা প্রেমচাঁদের হাতে দিলেন। প্রেমচাঁদ তদ্দ্বারা ধান্য কিনিয়া দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে দান করিতে লাগিলেন। দরিদ্রেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতে লাগিল, "যদুঘোষের বংশ, হবে না কেন? এখনও সকাল বেলায় তাঁর নাম করিলে দিনটা ভাল যায়। পরমেশ্বর করুন, আরও হউক। আর মানুষকে ওরা এমনি করে খাইয়ে বাঁচাক্।"

ভবতারণ এবং প্রেমচাঁদের সম্পত্তি সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই। তাঁহাদের কোন বড় জমিদারী নাই, তাঁহারা কোটিপতিও নহেন। ইঁহাদের পৈতৃক এক তালুক আছে। তাহার বার্ষিক আয় ছয় সহস্র মুদ্রার ন্যূন নহে। বাড়ীতে যে রাধা[illegible] বিগ্রহ আছেন, তালুক তাঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত।

এ ছাড়া ইঁহাদের নগদ টাকাও কিছু আছে। তাহা

ব্যবসায়ে খাটিয়া থাকে। তাহাতে বৎসরে যে আয় হয়, তাহা ভূসম্পত্তির আয়ের প্রায় সমান। তাই বলিয়াছি, ভবতারণ ঘোষ একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। পল্লীগ্রামে ইহাকে সমৃদ্ধিও বলা যাইতে পারে। সেখানে বার্ষিক সহস্র মুদ্রা আয় থাকা সামান্য কথা নহে।

সমগ্র বাজিৎপুরে এই ঘোষপরিবারই একমাত্র সম্ভ্রান্ত বংশ। সম্পত্তিশালী এবং সৎকর্ম্মান্বিত বলিয়া বহু দিন হইতে ইঁহাদের খ্যাতি। ভবতারণের পিতামহ যদুপতি ঘোষবংশের প্রসিদ্ধি অনেক বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন।





তৃতীয় অধ্যায়

শ্যামাচরণ ঘোষ।


ভবতারণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্যামাচরণ। কনিষ্ঠ শরচ্চন্দ্র। কন্যা সুরবালা সকলের ছোট। আমরা যে সময়ের কথা আরম্ভ করিলাম, তখন শ্যামাচরণের বয়স ত্রিশ হইয়াছে। শরতের বিশ বৎসর হইবে। সুরবালা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

শ্যামাচরণ সামান্য ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। চাকরীর চেষ্টা কখনও করেন নাই। তিনি বিষয় কর্ম্ম দেখেন। তরফ নুন্নগর ঘোষেদের তালুক। নুন্নগরে সদর কাছারী। নুন্নগর বাজিৎপুর হইতে চারি ক্রোশ মাত্র দূর। শ্যামাচরণের যেন কর্ম্মস্থল নুন্নগরে। সচরাচর তিনি সেখানেই অবস্থিতি করেন। প্রয়োজন হইলে বাড়ীতে আসিয়া থাকেন। সাধারণতঃ তিনি সপ্তাহে

একবার প্রায়ই বাড়ী যান। তবে তজ্জন্য তাঁহাকে রবিবার খুঁজিতে হয় না। আর অন্য দিনে বাড়ী যাইতে হইলেও অবশ্য কাহারও অনুমতি লইবার প্রয়োজন হয় না।

শ্যামাচরণের কাছারীবাড়ী অনেকের বাড়ী অপেক্ষা ভাল। নুননগরে ইঁহাদের খামার জমি অনেক। তাহাতে ধান্য প্রচুর জন্মিয়া থাকে। রাই সরিষা, মুগমটর প্রভৃতি অন্যান্য শস্যেরও অভাব নাই। এ ছাড়া কাছারীর সংলগ্ন ভূমিতে দু তিনটি বড় বাগান। তাহাতে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল ইত্যাদি ফলের গাছ অনেক; আর হরিদ্রা, আর্দ্রক আদি ক্ষুদ্র দ্রব্যও উৎপন্ন হইয়া থাকে। লাউ, বেগুণ, কুমড়ো এবং অন্যান্য শাক শব্জি বাঙ্গালার কোথায় না জন্মে? এ ত গেল ভূমিজ সামগ্রীর কথা। পুকুরের মাছ এবং গরুর দুধ শ্যামাচরণের কাছারীতে যথেষ্ট। সময়ে সময়ে তিনি দুগ্ধ বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। ঘৃত সর্ব্বদাই যাইয়া থাকে।

সকাল বেলায় মুখ হাত ধুইয়া শ্যামাচরণ কাছারীর বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুইটি অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। একের বয়স সাঁইত্রিশ আটত্রিশ এবং অপরের প্রায় পঞ্চাশ হইবে। শেষোক্ত ব্যক্তি এক কঠোর দৃষ্টিতে যেন শ্যামাচরণের সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া লইল। প্রথম লোকটির সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বোধ হইল, সে যেন কোন আশ্রয়স্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

শ্যামাচরণের নিকটস্থ হইলে তাহারা উভয়েই তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ

হইয়া নমস্কার করিল, এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি "একেবারে খোদ কর্ত্তাকে পাইয়াছি!" বলিয়া একখানি কাগজ শ্যামাচরণের পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া কাতরভাবে কহিল, "এই মুসাবিদাটা দেখিয়া দিবেন?"

শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ?" প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল, "আজ্ঞে এই দেবীপুর থেকে। আমাদের গ্রাম কর্ত্তার বাড়ী যাবার রাস্তায় পড়ে। এক দিন বৃষ্টি হওয়াতে কর্ত্তা ঘোড়া শুদ্ধ আমাদের গোয়ালঘরে দাঁড়িয়েছিলেন পর্য্যন্ত।"

এই "পর্য্যন্তে"র অর্থ এই যে, আমরা আপনার একরূপ পরিচিত।

পাঠক এইরূপ কাগজ-হস্ত দুইটি অপরিচিত লোকের আগমনে, এবং তদপেক্ষা তাহাদের এইরূপ পরিচয়প্রদানে, কি মনে করিতেন, জানি না। কিন্তু শ্যামাচরণ তাহাদিগকে "বস" ভিন্ন অন্য কোনও কথা না বলিয়া মনোযোগ-সহকারে সেই কাগজখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি তাহাদের পরামর্শদাতা উকিল নহেন। কিন্তু পল্লীগ্রামে এমন কাজ অনেকেই সন্তোষের সহিত করিয়া দিয়া থাকেন। সেখানে যদি তোমার লেখাপড়া জানা খ্যাতি থাকে, মধ্যে মধ্যে অজ্ঞ লোকেরা আসিয়া এইরূপ বিরক্ত করিবে, "মহাশয়, এই কবলার খসড়াটা দেখে দিন্ না।" "এই রসিদটা ঠিক্ হয়েছে কি না, দেখুন্ত!" "এ দলিলে ইসটাম্ (বা ইষ্টাম্বর) কত লাগ্‌বে

বলে দিন্ ত।" যদি তুমি দয়া করিয়া তাহাদের প্রার্থনা পূরণ কর, প্রায়ই এইরূপ লোক দু একটি দেখা দিবে; আর যদি রুক্ষস্বরে কয়েক ব্যক্তিকে তাড়াইয়া দাও, আর কেহ ঘেঁসিবে না। শ্যামাচরণ প্রথম প্রকারের লোক ছিলেন।

কাগজখানি দেখা শেষ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন. "কার্ত্তিক কার নাম?"

আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমার।" শ্যামাচরণ কহিলেন, "গোপাল গোবিন্দ গুরুচরণ তিন ভাই এরা তোমাকে ১২৴ বিঘা জমি বিক্রী কচ্ছে?"

কা। আজ্ঞে হাঁ।

অপর ব্যক্তি কহিল, "গোপাল আমার নাম। গোবিন্দ গুরুচরণ আমারই দু ভাই।" গোপালের চক্ষু দিয়া এই সময়ে এক ফোঁটা জল পড়িল। শ্যামাচরণ তাহা দেখিতে পাইলেন। তাহাদের আগমন সময় হইতেই কার্ত্তিক অপেক্ষা গোপালের প্রতি শ্যামাচরণের সমধিক প্রীতি জন্মিয়াছিল। প্রথম দর্শনেই সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে আমাদের অন্তঃকরণে একরূপ ধারণা হইয়া যায়; এই ধারণা হয় অনুকূল, না হয় প্রতিকূল। আগন্তুকদিগের আকৃতিগত পার্থক্যে শ্যামাচরণের মনে কার্ত্তিকের সম্বন্ধে প্রতিকূল আর গোপালের সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা হইয়াছিল। তাহাদের দৃষ্টিতে তিনি যে প্রভেদ দেখিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা এ জমি বেচিতেছ কেন?"

গোপাল কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই কার্ত্তিক আরম্ভ করিল,—"আমি বল্‌ছি শুনুন। ও বলুতে গেলে ছ মাস লাগবে। গোবর্দ্ধন দাস নামে এক গুরুমহাশয় আমাদের গ্রামে পাঠশালা করিত। গোপালের বাড়ীতেই তার বাসা ছিল। গোপালের একটি বিধবা মেয়ে আছে। বয়স তার ১৫।১৬ বৎসর হইবে। গ্রামে তার নামে আর গোবর্দ্ধনের নামে কলঙ্ক রটিল। আমাদের নমঃশূদ্রজাতির মোড়ল যারা, তারা গোপালদের জেতে ঠেলে রাখতে চাইলে। তখন্ আমিই তাদের পাঁচ কথা বুঝিয়ে বল্লুম—জিজ্ঞেস করুন গোপালকে সত্য কি মিথ্যে—তারা বল্লে গোবর্দ্ধনকে তাড়িয়ে দিলে আর সমাজে একটি ভোজ দিলে আর আমাদের কথা নাই। ওঁরা গোবর্দ্ধনকে তাড়ান। শেষ দিনে দু একটি ষণ্ডা জুটে গুরুমহাশয়কে কিছু দক্ষিণাও দিয়াছিল—তাতেই তার রাগ। সে লেখা পড়া জানে—আইন আদালত বোঝে—এক মাস না যেতে যেতেই এক জাল দলিল করে রেজেষ্টারি করিয়ে বসল। যেন গোপালেরা তাকে সবটুকু জমি জমা বিক্রী করেছে। ওরা কিছুই জানে না, কিন্তু আবাদের সময় গোবর্দ্ধন এল জমি দখল করতে। গোপাল অজ্ঞান। আমিই ওকে বল বুদ্ধি দিয়ে নিয়ে গেলুম রেজেষ্টরি আপিসে, জিজ্ঞাসা করুন সত্য কি মিথ্যে; গিয়ে দেখি দলিল রেজেষ্টরি করিয়েছে—ওদের তিন ভাইয়ের নামে।—একবারে গেলুম ওকে নিয়ে হাকিমের কাছারী। সেখানে ওকে দিয়ে করালুম গোবর্দ্ধনের নামে ফৌজদারী। তার পর সেই মোকদ্দমার

যোগাড়। ওরা ত সবই বুঝে। যা কিছু সবই আমি কল্লুম। ওরা মাত্র উপলক্ষি। টাকা কড়ি খরচপত্র তাও আমি দিলাম—সবই কেবল ওদের তিনটি ভাইয়ের মুখ চেয়ে—ভগবান তুমি জান্‌বে যার যেমন মন—শেষে বাড়ী আর হাকিমের কাছারী কর্ত্তে কর্ত্তে আমার পায়ের জুতা গেছে! জিজ্ঞেস করুন সত্যি কি মিথ্যে। গোবর্দ্ধনের দুই বৎসর কয়েদ হয়ে গেছে, আর সেই খরচার টাকার জন্যে এই দলিল।”

শ্যামাচরণ সমস্ত শুনিয়া গোপালের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

গোপাল এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, “আজ্ঞে হাঁ, খরচের টাকা আমরা যত পেরেছি ঘর থেকে দিয়েছি। বাকি উনি দিয়েছেন। আর মোকদ্দমার যোগাড় যাগাড় সে সব উনিই করেছেন।”

শ্যামাচরণ কহিলেন, “একটা ফৌজদারি মোকদ্দমায় এত খরচ?”

কা। আসামী হাজীর হয় নাই অনেক কাল। সমন, ওয়ারিন্, মাল ক্রোক, ইস্তাহার এ সব কর্ত্তে হয়েছে। তার পর সবরেজিষ্ট্রার বাবু আর অন্য সব সাক্ষীর খরচা বারবর্‌দারি এই সব, এতে অনেক পড়ে গেছে। তবু আমি যত কমে পারি, সেরেছি। এই দেখুন না কেন খরচের ফর্দ্দ। ওরা যা দেছে, তাও এতে লেখা আছে, আর আমি যা দিছি, তাও ঠিক আছে। তাই বল্‌ছিলুম গোপালকে আপনার এখানে আস্‌তে আস্‌তে যে, এখানেই যাও, আর যেখানেই যাও, কার্ত্তিকের কাজ কাঁচা

পাবে না। আর দলিল দেখান, তা আর দেখাতে হবে কেন? আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার ঐ সব কর্ত্তে কর্ত্তে চুল পেকে গেল। বলিনি ওকে যে, দলিল দেখিয়ে কি হবে? একবার লেখাপড়া করে নে চল সবরেজেষ্টরি আপিসে; রেজিষ্টার বাবু যদি বলে কোন দোষ হয়েছে, তা'হলে কাগজের দাম আমি দিব।

এতক্ষণে কার্ত্তিক তাহার হিসাবের ফর্দ্দটি শ্যামাচরণের হাতে দিল।

শ্যামাচরণ তাহার শেষ কথার উত্তরে বলিলেন, "হাঁ, দলিল ঠিক লেখা হয়েছে।"

গোপাল কহিল, "ধান জমিটি সব উনি নেবেন। আর বাড়ীটি আমাদের থাকবে। ঐ ১২৴ বিঘাই আমাদের মোট জমি। ১০৴ বিঘা ধান জমি, আর দু বিঘা বাড়ী।"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "কই, তা এতে লেখা নাই।"

কা। তা ওতে থাক্‌বে কেন? আপনি কিছু না বুঝিবেন, এমন নয়। ১২৴ বিঘা জমি এক জমার ভিতর; এ খণ্ড করে নিতে গেলে গোল হবে। তাই বলছি, সবটা লিখে নিয়ে বাড়ীর জমিটার আলাহিদা পাট্টা করে দিব। তাও কিছু বেশী বলি নাই। পাঁচটি টাকা খাজনা চেয়েছি। গোপালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ওহে বাপু, এই একটি কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না? খত নাই, পত্র নাই, যখন ঘর থেকে দেড় শত টাকা ক্রমে ক্রমে তোমার জন্যে বার করে দি—তখন ত, বিশ্বাস ছিল। কলির ধরণই এই। সবই ত নিয়েছিল গোবর্দ্ধন, ভগবান তুমি

জেনো—পরের মন্দতে কোন দিনই আমি যাই নাই, সে মতি গতিও যেন না হয়।” গোপাল কোন উত্তর দিতে পারিল না।

শ্যামাচরণ কহিলেন, “মোট বার বিঘার খাজনা ৯৲ ন’ টাকা ত?” গোপাল কহিল, “আজ্ঞে হাঁ, পৈতৃক জমা—অনেক কালের, তাই এত কম দর।” এতক্ষণে শ্যামাচরণের হিসাবটি দেখা হইয়াছে। তিনি কহিলেন. “ওহে বাপু, এ দেড় শ’ টাকার মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি অর্দ্ধেক আন্দাজ ঘুস্।”

কা। আজ্ঞে বলেন কি, ঘুসের বাজার যে চড়েছে। কোম্পানি সব আমলাদের মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছে; ভাব্‌ছে ঘুস্ কমে যাবে। এ দিকে হচ্ছে উল্‌টো। সেকালে যার মাইনে ছিল ১০৲ টাকা, তাকে চারি গণ্ডা পয়সা ঘুস দেওয়া চলত। এখন তার মাইনে হয়েছে ত্রিশ টাকা। কাজেই একটা টাকার কম তার সাম্‌নে ধরা যায় না। তিন কুড়ির কাছাকাছি বয়স হবে আমার। একাল সেকাল সব দেখেছি।

শ্যামাচরণ “তা বটে” ভিন্ন আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। ফলতঃ সমস্ত শুনিয়া তাঁহার মনে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, গোপাল বিনা দোষে সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছে। কা’ল সে বার বিঘা জমির মালিক্ ছিল, আজ মাত্র দু’ বিঘা জমি লইয়া এক জনের কোর্‌ফা হইয়া থাকিবে। তাহার দোষ কি? প্রতারক প্রবঞ্চনা করিয়াছিল, তাহাই প্রমাণ করিতে সে রাজদ্বারে উপস্থিত হয়। যে সম্পত্তি উদ্ধারের নিমিত্ত বিচারপ্রার্থনা, বিচারব্যয়ে এখন তাহাই বিক্রীত

হইয়া যায়। বিচার এত মহার্ঘ কেন? বিচারদ্বার সকলের পক্ষে সুগম নহে কেন? গোপাল যে কার্ত্তিকের ন্যায় রক্ত-শোষকের আশ্রয় লইয়াছিল, সে কেবল বিচার পাইবার নিমিত্ত। কার্ত্তিক তখন উপকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন তদপেক্ষা অনেক অধিক অপকার করিতে বসিয়াছে। বলা বাহুল্য, শ্যামাচরণ কার্ত্তিকের হিসাব বিশ্বাস করেন নাই। গোপালের ন্যায় অজ্ঞ কৃষক ভিন্ন কেহই তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না।

শ্যামাচরণ সহসা কহিয়া উঠিলেন, "গোপাল, তোমাদের এ টাকা শোধ কর্‌বার কি কোনই উপায় নাই?

গো। আজ্ঞে, কিস্তিবন্দী করে নিলে দিতে পারি। উনি শুদ যা চান, তাই দিতে রাজি আছি। তিনটি ভাই আমরা—সকলেই খাট্‌তে পারি।

শ্যামাচরণ কার্ত্তিককে কহিলেন, "তাই নাও না?"

কা। সে হবে না। আমি নারাজ ছিলাম না। কিন্তু ছেলের মত হয় না! আজ কাল সব সেই করে।

শ্যা। তুমি বুঝিয়ে বল্লে হতে পারে। শুদ পাচ্ছ ত।

কা। আজ্ঞে সে হবে না। তার এক কথা,—হয় টাকা দিক্, না হয় জমি দিক্। পরে, গোপালের দিগে মুখ ফিরাইয়া কহিল. "কিহে বাপু, উঠ্‌বে!"

এই সময়ে গোপালের কাতর নয়ন শ্যামাচরণের চক্ষুর উপর স্থাপিত। যেন নীরবে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতেছে।

গোপালের আজ সুপ্রভাত যে, সে বরাবর রেজিষ্টরি আপিসে

না যাইয়া শ্যামাচরণের কাছারীর কাছে আসিয়া থামিয়াছিল, এবং একরূপ জোর করিয়াই কার্ত্তিককে তথায় লইয়া গিয়াছিল।

গোপালের নীরব প্রার্থনা নিষ্ফল হইল না।

শ্যামাচরণ একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন, এবং তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আমাদের একজন হানুয়ার দরকার না?"

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে হাঁ।

শ্যা। একজন হানুয়ার মাইনে কত?

কর্ম্মচারী। আড়াই টাকা, তিন টাকা, এই রকম। বার মাস রাখ্‌তে গেলে কম হয়। অল্প দিন হইলে বেশী হয়।

শ্যা। ধর ২৷৷৹ টাকা। তা হ'লে বছরে হল ৩০৲ টাকা। এ দিকে হচ্ছে ১৫০৲ টাকা। তিন পাঁচে পনের। দেখ গোপাল, তুমি কি তোমার এক ভাই, যদি পাঁচ বছর আমার কাজ ক'রে দাও, তা হ'লে কার্ত্তিকের টাকা আমি দিয়ে দিতে পারি।

গোপাল কহিল, "আজ্ঞে আমরা তিন ভাই সারা জীবন খেটে দিব।" আর কি বলিবে, গোপাল তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা তাহার মুখে উছলিয়া পড়িতেছিল।

কার্ত্তিকের ভাব অন্যবিধ। বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন চারি দিকে উন্মত্তের ন্যায় চাহিয়া থাকে, সে তাহাই করিতেছিল। তথায় মানুষ আছে বলিয়া তাহার মনে ছিল না। শ্যামাচরণ যখন গৃহাভ্যন্তর হইতে দেড় শত টাকা আনিয়া তাহাকে গণিয়া দিলেন এবং কহিলেন, "এই তোমার টাকা," তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। কোন অপরিচিত স্থানে পরিচিত লোকের দর্শন

পাইবার আশায় গমন করিয়া তাহার সাক্ষাৎ না পাইলে মনে যে চাঞ্চল্য জন্মে, ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত পথিক নিশাসমাগমে গৃহস্থের আলয়ে আসিয়া "এখানে থাকিবার স্থান হবে না" শুনিলে অন্তঃকরণে যে কষ্ট অনুভব করে, অ-মুরুব্বী অন্নহীন অথচ উপযুক্ত উমেদার, বিত্তবান্ বড়লোক-সহায় অথচ অনুপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে মনে মনে যেমন রুষ্ট হয়, কার্ত্তিক সে সময়ে তদপেক্ষা অনেক অধিক রোষ, কষ্ট এবং চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিল। সম্মুখে টাকা দেখিয়াই সে কহিয়া উঠিল, "আজ্ঞে, ওর সঙ্গে আমার আরও দেনা পাওনা আছে।"

শ্যামাচরণ গোপালের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

গোপাল কহিল, "আজ্ঞে, আর এক পয়সাও না। বয়সে কারও এক কড়া কড়ি ধার করি নাই। এবার এই গ্রহের ফের—যা এই মোকদ্দমাতে—"

কা। সতের দিন ধ'রে যে মোক্তার খুঁজে দিলুম, উকিল ধ'রে দিলুম, তার কি কিছু পাব না?

শ্যা। সে ত তুমি ছেড়েই দিয়েছ।

কা। ছেড়ে দিয়েছিলাম জমি দিচ্ছিল ব'লে। তা যখন দিলে না, ছাড়ব কেন?

গো। তা ব'লে আমি দেব পাঁচ টাকা।

শ্যা। তুমি ত নিজেই দেড় শ' টাকা ব'লেছ?

কা। আমার ছেলেকে না জিজ্ঞেস ক'রে টাকা নিতে পা'র্ব্ব না।

শ্যা। এই না ব'ল্‌ছিলে তোমার ছেলেই ব'লেছে টাকা নিতে ?

বস্তুতঃ যে কার্ত্তিক প্রথম হইতে খুব পাকা লোকের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এখন সে-ই ঠিক যেন পাগলের মত যা ইচ্ছা তাই আপত্তি তুলিতেলাগিল। সমগ্র দেবীপুরে কার্ত্তিকই একমাত্র লেখাপড়াজানা চণ্ডাল। তাহার জীবনের কার্য্য অপরের মাম্‌লা মোকদ্দমার যোগাড় করা এবং তাহা হইতে আপন স্বার্থ সাধিয়া যাওয়া। গ্রামের কোন মোকদ্দমা হইলে কার্ত্তিকের পোহাবারো। সে যখন শ্যামাচরণের কাছারীতে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার আশার একবারে মূলোচ্ছেদ হইবে। সে জানিত, হয় তাহার হিসাবে দোষ বাহির হইবে, না হয়, গোপালের বাড়ীর জমিটার পাট্টা এক সঙ্গে করিয়া দিতে বলিবে। তাহার মনের দোষ এবং দুর্ব্বলতা এই দুই স্থানেই ছিল। খরচের হিসাবে বিস্তর মিথ্যা কথা লেখা ছিল। আর বাড়ীটির খাজনা এখন বলিতেছিল পাঁচ টাকা, মনে মনে ভাবিয়াছিল, একবার কবালাটা হ'য়ে গেলে হয়। শেষে এক জনকে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিব, কি করি গোপাল, আমি ত পাঁচ টাকায় দিতে রাজি ছিলাম, কিন্তু ছেলে ছাড়ে না। তোমরা উঠে গেলে, অন্য লোকে ৮৲ টাকা দিতে প্রস্তুত। বস্তুতঃ এখনকার হিসাবে সে দু বিঘা জমির খাজনা আট টাকা হওয়া অসম্ভব নয়। তবে কার্ত্তিকের পক্ষে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, জমিটা দিয়া আর পঞ্চাশটি টাকা নগদ চাহিলেও

সে তাহা দিতে রাজি হইত। জমিটিই তাহার লক্ষ্য। এই ম ধরিয়াই সে এ ক্ষেত্রে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। সে ম একবারে নিষ্ফল হইবে, ইহা সে কখনও ভাবে নাই। তা তাহার এখন ইহা ভাবিতে এত কষ্ট হইল। জীবনে সে এম করিয়া কত লোকের জমি অল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে হস্তগত করিয়াছে। এরূপ মনস্তাপ এই তাহার প্রথম।

কার্ত্তিকের কোন আপত্তিই টিকিল না। অগত্যা তাহাকে দেড় শত টাকা লইয়া রীতিমত একখানি রসিদ লিখিয়া দিতে হইল। তখন বেলা হইয়া গিয়াছে, শ্যামাচরণ দু জনকে কহিলেন, "এখানে স্নান করে দুটি খেয়ে যাও।"

কার্ত্তিক কর্কশ স্বরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, বাড়ী যেতে হবে।" গোপালের আপত্তি করিতে মন সরিল না। সে কহিল, "আমি দুটি প্রসাদ পেয়েই যাব।"

যাইবার সময়ে কার্ত্তিক গোপালের দিকে এক তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে দৃষ্টি প্রসন্ন নহে। তাহার অর্থ এই যে, থাক, আজ যাহা করিলে, ইহা যেন মনে থাকে।

আহারান্তে গোপাল বাড়ী গেল। পরদিন প্রভাতে তাহারা তিন ভাই আসিয়া উপস্থিত। শ্যামাচরণ কহিলেন, "গোবিন্দ থাকুক। পাঁচ বৎসর থাকিবে বলিয়া ঐ একটা দলিল লিখিয়া দিক্।"

গোবিন্দ রহিল। যাইবার সময়ে গোপাল কহিয়া গেল,

"আজ্ঞে গোপাল গুরুচরণও আপনারই। যখন বলিলেন, তখনই হাজির পাইবেন।"

বাড়ীতে পূর্ব্ব রাত্রিতে "যদু ঘোষের কাছারীতে আমি থাকিব, আমি থাকিব" বলিয়া, তাহারা তিন ভাই পরস্পর কলহ করিয়াছিল।





চতুর্থ অধ্যায়।



বৈশাখ মাস। বেলা তিনটা বাজিয়াছে ঘোষেদের বাড়ীতে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গিয়াছে। বাটীর ভিতরে, নিম্নতলের একটি প্রকোষ্ঠে এক-খানি পালঙ্কোপরি ভবতারণ শুইয়া আছেন। ভবতারণ সাধারণতঃ এই স্থানেই ঘুমান। কিন্তু সেটি যে শয়নকক্ষ, ইহা পালঙ্ক এবং নিদ্রিত ব্যক্তিকে দেখিয়াই বুঝা যায়। তাহাতে বড় আরসি নাই, টেবিল নাই, ছবি নাই; বরং এক ধারে একটি সেকালের সিন্ধুক আছে।

ভবতারণ নিদ্রিত বটে, কিন্তু নিদ্রা যেন গাঢ় নহে। শয়নের ভাব দেখিলেই বোধ হয়, যে বিশ্রাম তাঁহার উদ্দেশ্য। পা দুইটি পালঙ্কের বাহিরে; উপাধান মস্তকে নহে, বক্ষঃস্থলে। দিনের বেলা ভবতারণ এইরূপেই ঘুমান। প্রয়োজনমত সামান্য শব্দ শুনিলেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; আবার যাহাতে তাঁহার

উঠিবার আবশ্যক নাই, এমন শব্দ সহস্র হইলেও তাঁহার বিশ্রামে বাধা হয় না। একজন অতিথি আসুক, বাহিরে আসিয়া শব্দ করিবামাত্র তিনি উঠিয়া বসিবেন; এবং মুহূর্ত্তমধ্যে বহির্বাটীতে আসিবেন—ঠিক যেন জাগ্রতের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ দিকে অন্য কারণে ভৃত্যেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করুক, গৃহিণী কন্যা কিংবা বধূর সহিত কথাবার্ত্তা বলুন, ভবতারণের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিবে না। দার্শনিকেরা ত এইরূপই বলিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ মনের দাস। মন সর্ব্বদা জাগরিত। ইচ্ছা করিলে সে তাহাদিগকে জাগাইতে পারে, আবার নাও পারে।

কাজ না থাকিলেও ভবতারণ যে সময়ে উঠেন, সে সময় প্রায় হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার গৃহিণী আহারান্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং একটি তাম্বুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

প্রেমচাঁদের মাতা বৃদ্ধ বলিয়া ভবতারণের স্ত্রীই এখন সংসারের কর্ত্রী। বাটীর সকলের সেবা করাই যেন তাঁহার জীবনের কর্ম্ম। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি অকাতরে পরিশ্রম করেন। বাটীর এমন স্থান নাই, যাহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই তিনি অতিথিশালায়, এই তিনি রন্ধনগৃহে এই তিনি ঠাকুরঘরে, এই তিনি ভাণ্ডারে। বাটীতে একজন ভৃত্য অভুক্ত থাকিতে তিনি নিজে আহার করেন না। দরিদ্র প্রতিবেশীদিগের কেহ অনাহারে রহিল কি না, এ সংবাদও

তাঁহার লওয়া আছে। এমন কি গাভীগুলি উপযুক্ত আহার পাইল কি না, তাহাও তিনি সন্ধান করিয়া থাকেন। প্রভাতে বাটীর অন্যান্য গৃহ এবং প্রাঙ্গণগুলি যেমন পরিষ্কৃত হয়, তেমনই গোশালা হইতে গোময়, গোমূত্র প্রভৃতি অপসৃত হইল কি না, ইহা তাঁহার জানা চাই। দিনে আড়াই প্রহর এবং রাত্রিতে দ্বিপ্রহরকাল পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে মৎস্য, দুগ্ধ এবং অন্যান্য আহার্য্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত থাকে। বাড়ীর সামান্য কোন চাকর চাকরাণীর পীড়া হইলে, সহস্র কাজ সত্ত্বেও গৃহিণী দিনে দশ বার তাহার শয্যাপার্শ্বে। গৃহিণী দেখিলেন, পশ্চিম দিকের একটি জানালা দিয়া ঘরে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে, এবং ভবতারণের ললাটে ও বক্ষঃস্থলে দু এক বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। তিনি জানালাটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

ভবতারণ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং ক্ষণকালমধ্যেই উঠিয়া বসিলেন। গৃহিণী কহিলেন, "ঘুম হ'ল ?"

ভ। হাঁ, একটু জল দাও, চ'খে দি।

চক্ষে জল দিয়া ভবতারণ বসিয়াছেন, গৃহিণী সহাস্যবদনে কহিলেন, "দেখ্‌বে এস।"

ভ। কি দেখ্‌ব ?

গৃ। দেখ্‌বে এস না।

এই বলিয়া গৃহিণী তাঁহাকে ভাঁড়ারঘরের দিকে লইয়া চলিলেন।

ভবতারণ কহিলেন, "কি দেখাবে বলই না ?"

গৃহিণী কহিলেন, "সে দিন যখন ছোট বউ (প্রেমচাঁদের স্ত্রী) বাপের বাড়ী যায়, সুরি তাকে সব গুছিয়ে দিলে। কা'ল সুরি যাবে শ্বশুরবাড়ী, আমি বলিলাম, 'নে না, যা তোর ইচ্ছা হয়, ভাঁড়ার থেকে গুছিয়ে নে।' সে কিছুতেই হাত দিল না। তাই আমি বউমাকে বলেছিলাম, তোমার ননদ শ্বশুরবাড়ী যাবে, কিছু জিনিষ পত্র দাও। তা এমনি গুছিয়ে রেখেছে, তুমি দেখ্‌লে অবাক হবে।"

ভ। বটে!

গৃ। দেখনা।

ভবতারণ দেখিলেন, কতকগুলি মুখবাঁধা হাঁড়ি ভাঁড়ারের একধারে সজ্জিত রহিয়াছে।

ভবতারণ কহিলেন, "খোল দেখি এক একটি, আমি দেখি।"

গৃহিণী মুখ খুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন, কোনটিতে ঘি, কোনটিতে আকের গুড়, কোনটিতে মুগের দাইল, কোনটিতে পুরাণ তেঁতুল, ইত্যাদি।

সুরবালা এবং কামিনী পার্শ্বের এক ঘরে বসিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণের স্ত্রীর নাম কামিনী।

ভবতারণ পুত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "মা, একবার এ দিকে এস!"

কামিনী শ্বশুরের সাক্ষাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাহির হন না, কিন্তু ভবতারণ নাছোড় বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আসিতে হইত।

তাঁহার শ্বাশুড়ী যাইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যাও না একবার, ডাক্‌ছেন যে। যাও, ওঠ।"

কামিনী বাহির হইয়া শ্বশুরের সমক্ষে আসিলেন।

ভবতারণ সুরবালাকে শুনাইয়া কহিলেন, "হাঁ মা. পরের ঘরে দেবার জন্যে এমন করে গুছিয়া দিয়েছ ?"

কামিনী কথা না কহিয়া অগ্রসর হইলেন, এবং সাবগুণ্ঠন-মস্তকে একবার শ্বশুরের চরণতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া গৃহের দিকে ফিরিলেন।

ভবতারণ, "লক্ষ্মী মা আমার—সাবিত্রী সমান হও," বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

হিন্দুর গৃহ ভিন্ন শ্বশুরের এমন আদর বধূর ভাগ্যে অন্য কোথাও ঘটে কি ?

ভবতারণ ও গৃহিণী ফিরিলেন। উভয়ের মুখে আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। গৃহিণী কহিলেন, "এ বয়সে অমন বুদ্ধি আমি দেখি নাই। সুরিকে এত ভালবাসে! আঁর মন কেমন—আমি শুন্‌ছি দাঁড়িয়ে—সুরি বল্‌ছে, 'প্রায় সব ঘিটাই যে দিলে' ; বউমা বলছেন, 'দিলাম দিলাম, আমাদের হয় ত কালই আবার আস্‌বে তালুক থেকে'।"

ভবতারণ বলিলেন, "সাধে কি বলি, 'সে কালের কথা বড় ঠিক।' মেয়ে আন্‌বে পড়ন্ত ঘর থেকে—দেবে উঠন্ত ঘর দেখে—কত বড় ঘরের মেয়ে—আজ কাল যেন পড়ে গেছে—নজরটা যাবে কোথায় ?"

গৃ। তা ঠিক। লোককে দিতে পারলে কি এত খুসি! গরীব দেখলে আর রক্ষা নাই। মাস পাঁচেকের কথা হবে—তখন বউমা আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কন না—একটা কঙ্গাল বুড়ী এসেছে সকাল বেলায় ভিক্ষা কর্ত্তে, শীতে কাঁপছে থর থর করে—এসেই বলছে, মা এক খানা—কাপড়।' বউমা নিজের বাক্স থেকে দিব্যি একখানি মোটা কাপড় বা'র করে এনে আমাকে দেখাচ্ছেন—কেন না 'দিব?' আমি বলিলাম, দাও। ও পাড়ার বামুন ঠাকরুণ তোমাকে যে কাপড় খানা দিয়াছিলেন, সেইখানা দিলে হ'ত না? তা ঝিকে দিয়ে বলালেন, 'ও খানা এর চাইতে পাতলা। বেশী দিন টেক্‌বে না—আর, ও বুড়ী যদি এখনই তাঁর বাড়ীতে যায়, তিনি হয় ত কাপড় দেখে চিন্‌তে পার্ব্বেন, তাঁর মনে কষ্ট হবে। ভাববেন যে খারাপ কাপড় ব'লে পরেনি।'

ভ। বটে!

এই সময়ে সুরবালা দরজার নিকটে আসিয়া ব্যগ্রতার সহিত কহিল, "ওমা, মা, ছোটদা এসেছেন।"

গৃ। কই?

শরৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন—

ভ। কাল আসবার কথা ছিল না? একদিন এগিয়ে এসেছ।

শরৎ পিতা মাতার চরণ বন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "হাঁ কালই আসবার কথা ছিল, কলেজ বন্ধ হল, দুপুরের পরই বেরিয়ে প'ড়লাম।"

ভ। তা বেশ করেছ— কাল এলে হয় ত সুরবালার সঙ্গে দেখা হত না। ও কালই শ্বশুরবাড়ী যাবে।

এই সময়ে সুরবালা আসিয়া দাদার কাছে দাঁড়াইল।

পাঠক একবার সুরবালাকে দেখিয়া নিন। সুরবালা সুরবালাই বটে। তাহার পদ-নখে শরদিন্দুর ছড়াছড়ি নাই। কৃষ্ণ কেশরাশি দেখিলেও কেহ সর্পভয়ে যষ্টি তুলিবে না। দন্ত-পাঁতির এক একটী খুলিয়া দিলেও কেহ মুক্তাভ্রমে ক্রয় করিবে না, ইহা নিশ্চয়। অথচ সুরবালা সুকেশী, সুদতী, তাহার পদনখ বিনা অলক্তেও রক্তিম-আভাযুক্ত বটে। এক কথায় সুরবালা সুন্দরী। তাহার সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক এবং স্থির। তাহাতে মাধুরী আছে, মোহ নাই। লাবণ্য আছে, চাঞ্চল্য নাই। সে অযত্নসুলভ সৌন্দর্য্যে কৃত্রিমতা বা অভিমানের ছায়ামাত্র নাই। দেখিলেই মনে হইবে, সে যেন সেবিত হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না—সেবা করিতে চাহে। সাধু সে মূর্ত্তিতে যাহা দেখিতে পাইবে, পাপী তাহা পাইবে না। একের প্রতি দেবতাজ্ঞানে সে যেন আকৃষ্ট হয়, অন্যকে পশু ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান করে। হিন্দুর গৃহে অন্যবিধ সৌন্দর্য্যের আদর অতি অল্প।

শরৎ সুরবালার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি হাব্‌লি! কা'ল এলে তোর সঙ্গে দেখা হ'ত না?"

শরৎ সুরবালাকে আদর করিয়া হাব্‌লি নামে ডাকিতেন। এ নামের কিছু অর্থও না ছিল, তাহা নহে। সাধারণতঃ কোন বালিকা কিছু বোকা হইলে তাহাকে হাব্‌লি নাম দেওয়া হয়।

সুরবালা শৈশব হইতেই সরলতার প্রতিমা ছিলেন। তাই শরৎ তাহাকে আহ্লাদ করিয়া এই নাম দেন। শরৎ ও সুরবালায় ভালবাসা বড়ই অধিক। বয়সের অল্প পার্থক্য বলিয়া তাহাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা। শ্যামাচরণ তাহাদের উভয়ের অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া তাহারা তাঁহার কাছে বড় একটা ঘেঁসিত না। সুরবালা শ্বশুরবাড়ীর নাম শুনিয়াই লজ্জিত হইল, এবং কোন কথা না কহিয়া অবনতবদনে শরতের চরণে নমস্কার করিল। সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতাও এক এক নমস্কার পাইলেন।

বঙ্গগৃহে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এখনও এই নিয়ম যে, যেখানে কাহাকেও নমস্কার করিবার প্রয়োজন হইবে, সেখানে সমাগত সমস্ত গুরুজনকেই অভিবাদন করিতে হইবে। নমস্কার ব্যাপারে সুরবালার মস্তকের অযত্নসংন্যস্ত কেশগুলি ললাটদেশ আচ্ছাদিত করিয়াছিল—দুএকটি চক্ষের উপরও না আসিয়াছিল, এমন নহে। সুরবালা মস্তক উত্তোলন করিবামাত্র শরৎ তাহার চুলগুলি মাথার উপরে আনিয়া দিলেন, এবং কহিলেন, "আঃ হাব্‌লি, আজও চুলগুলি সমান কর্ত্তে শিখ্‌লিনে! কা'ল না শ্বশুরবাড়ী যাবি?"

সুরবালা শরতের কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "ছোটদা, তোমার খাওয়া হয়েছে?"

শ। সন্ধ্যা হয়, আর আমার খাওয়া হয় নি? রাস্তায় খেয়ে এসেছি।

গৃহিণী সুরবালার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শরতের একটু পা ধোবার জল এনে দে।"

সুরবালা চলিল।

শরৎ বলিলেন, "থাক্, এসে মুখ হাত ধুচ্ছি। একবার ঠাকুরঘরে যাই, ছোট ঠাক্‌মাকে প্রণাম করে আসি। কাকা বাবু বুঝি বাড়িতে নাই?"

ভ। না, আজ সন্ধ্যা বেলায় আস্‌বে। শ্যামও আস্‌বে কথা আছে। শরৎ চলিয়া গেলে গৃহিণী কথা পাড়িলেন, "এই-বার শরতের বে'টা দিয়ে ফেল।"

ভ। মুখ দিয়ে বা'র কর্‌লেই হয়। কত যায়গা থেকে সম্বন্ধ আস্‌ছে।

গৃ। দত্তপুকুরের মিত্রেরা ত অনেক দিতে থুথে চায়, আর শুনেছি মেয়েটিও পরীর মত।

ভ। ও কথা ব'লো না। শ্বশুরের দেওয়ায় কি মানুষের কুলায়? আজকাল যে সব কাণ্ড আরম্ভ হ'চ্চে শুনি—তারা যা ইচ্ছা ক'রে দেবে, সেই ভাল। লোককে জব্দ করে নেওয়া পেজোমি।

গৃ। সে তুমি যা ভাল বোঝ, ক'রো। বে'টা দিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি।

ভ। আসুক প্রেমচাঁদ আর শ্যামাচরণ—শরৎকেও এক-বার জিজ্ঞাসা করা ভাল।

গৃ। ওকে আবার কি জিজ্ঞেস কর্‌বে?

ভ। বয়স হয়েছে—বুদ্ধি হয়েছে—

গৃ। হাঁ, যা নয় তাই—ছেলেকে আবার জিজ্ঞেসা।

এই সময় শরতের প্রত্যাগমনে ইঁহাদের কথোপকথন চাপা পড়িয়া গেল।





পঞ্চম অধ্যায়।



"না সে ছেলে কিছুতেই মাছ খাবে না।"

প্রেমচাঁদের জননী এই কথা বলিতে বলিতে ভবতারণের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন—

ভবতারণ জিজ্ঞাসিলেন, "কি হয়েছে কাকিমা?"

পূর্ব্বাধ্যায়ের লিখিত ঘটনার পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে একদিন মধ্যাহ্নসময়ে, ভবতারণের আহার শেষ হয়, এমন সময়ে, শরৎ আসিয়া বাড়ীতে পঁহুছিয়াছেন। আহারান্তে ভবতারণ তাম্বুল চর্ব্বণ এবং তামাকু সেবন করিতেছেন, শরৎ বাড়ীর ভিতরে আহারে নিযুক্ত, সেই সময়ে ভবতারণের পিতৃব্যপত্নী—যেন আপন মনে বকিতে বকিতে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন; তাহাতেই ভবতারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে কাকিমা?"

বাস্তবিক বৃদ্ধার আপন মনে বকা উদ্দেশ্য নহে। ভবতারণকে কথাটি শুনাইবেন বলিয়া তিনি সেখানে আসিয়াছেন। অন্তের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার ইচ্ছায় অনেকে অনেক সময়ে এই ভাবে কথা আরম্ভ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক এবং মূর্খেরই এই স্বভাব প্রবল। তুমি বসিয়া আছ—রামার মা সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, বাতাসের সহিত বলিতে বলিতে যাইতেছে, "যিনি যেমন দেখেন, ভগবান জান্‌বেন। কখনও কারও মন্দ জানি না, যিনি মন্দ ভাববেন, তার বিচার তিনিই করিবেন"—তোমার কর্ণ আছে, তুমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবে, "কি হয়েছে রামার মা?"

"এই ও বাড়ীর বড় কর্ত্তার কথা ব'ল্‌ছিলাম—আমার রামকে দু চক্ষের বিষ দেখেন। সে দিন"—বলিয়া রামার মা তার বক্তৃতার ঝুড়ি খুলিয়া বসিল।

অথবা রামার বাপ দীনু দত্তই যাইতেছেন—

বিড়্ বিড়্ কচ্ছেন, "না এলেন, নাই এলেন- পড়সী আর আরসি সমান; যেমন দেখাবে, তেমনি দেখাব—"

তুমি জিজ্ঞাসিলে, "কি হয়েছে গা?"

"এই রামার বে'তে নিমন্ত্রণ করেছিলাম্ প্রতাপ ঘোষকে, তা অহমিকে ক'রে আঁসা হল না" বলিয়া দীনু তাহার ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত সমস্তব্য বিবৃত করিতে লাগিল।

প্রেমচাঁদের জননীও ঠিক এই ভাবে কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভবতারণ যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে

কাকিমা ?” অমনি তাঁহার উৎস ছুটিল। আরম্ভ করিলেন, “না, ঐ তোমার বিদ্বান্ ছেলে, এবার নূতন বিদ্যা ক’রে এসেছেন ‘মাছ খাব না’।”

ভ। কে ? শরৎ ? প্রবৃত্তি না হয়, নাই বা খেলে !

এই সময়ে ভবতারণের গৃহিণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় বৃদ্ধা সরিয়া গেলেন।

গৃহিণী আরম্ভ করিলেন, “নাই বা খেলে ? তুমিই ত মাথা খেলে। একেবারে কিছু বলবে না ?

ভ। কি বল্‌ব ? অন্যায়টা কি করেছে যে বলব্ ?

গৃ। অন্যায় কি করবে ? ছেলে যে বিগড়েছে, তা কি টের পাচ্ছ না ? সুরি শ্বশুরবাড়ী গেছে বৈশাখ মাসে—এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রাণ, সাত আট মাসের মধ্যে ছেলের যেন সব উল্‌টে গেছে। পূজোর ছুটিতে ত বাড়ীই এল না, শীতের ছুটিতে এসেই এই। সেই এক বে’র কথা বল্লে, ভাল, তাই না হয় শুনুক ; তা না—বি এ পাশ না করে আমি বে’ ক’রব না। ছেলের বে’ বাপ মায় দেবে—এ আবার কি নূতন কথা যে, ছেলের মন না হলে বে’ হবে না। তুমিই ত সব নষ্টের মূল। ছেলে বল্লে,—ছেলে বয়সে সুরির বে’ দেওয়া হবে না, তা প্রকৃত বার বছরের না হ’লে ঘর থেকে মেয়ে বা’র কল্লে না। ছেলে এখন ভাবে, মেয়ের বেলায়ই যখন আমার আব্‌দার চলেছে, তখন আমার বেলায় আমি যত বয়স ব’লব, তাই হবে। আর।—”

এইবার গৃহিণী স্বর ছোট করিলেন, এবং স্বামীর কর্ণের কাছে মুখ লইয়া কহিলেন, "এই বেলা যা' তা' একটা গলায় গেঁথে না দিলেও ছেলে আর বশে থাক্‌বে না—হয় ত কোন দিন কল্‌কাতায় বে' ক'রে বস্‌বে। এই যে পূজোর সময় বাড়ী এল না, ঘরে সোমত্ত বউটি থাক্‌লে অবশ্যই আস্‌ত।"

ভ। আঃ বুদ্ধি! শীতের ছুটী কাছে ব'লে পূজোয় আসেনি। আর কল্‌কাতায় বে' কর্‌বে, তাতে তোমার ভয় কি? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ তাই থাকে, হবে।

গৃ। অমন কথা ব'লো না। ছেলের বে' দিয়ে ঘরে বউ আনে—সেখানে শুনেছি, বে দিয়ে ছেলেটিকে বেচে আস্‌তে হয়।

ভ। সে ঘর বিশেষ আছে—মেয়ে বিশেষ আছে—ছেলে বিশেষ আছে—কপালে তাই থাকে, হবে।

গৃ। তুমি ত এক কপাল ভেবে রেখেছ—সব তাতেই কপাল—আপাততঃ যা হয়েছে, তার কি?

ভ। কি হয়েছে?

গৃ। মাছ যে খাবে না? আর সে কেমন? আমি, ছোট ঠাকরুণ, শেষকালে বউমা, যে আজও ওর সাম্‌নে বেরোয় না, সে পর্য্যন্ত এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে,—আমি এত সাধ্য সাধনা—ছেলে চকের জল ছেড়ে দিলে। বলে, 'মা, আপনি মা হ'য়ে আমাকে অন্যায় কাজ কর্ত্তে বলেন?'

ভ। বেশ ত বলেছে। ওর যদি প্রবৃত্তি না হয়, নাই বা খেলে মাছ।

গৃ। ও যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যাবে—

ভ। ব্রহ্মজ্ঞানী কি গালাগালি? ব্রাহ্মদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন শুনেছি—যে তাঁদের পূজা কর্ত্তে হয়। ভগবানকে ভজ, যিনি যে ভাবেই ডাকুন, মন ঠিক থাক্‌লেই হ'ল।'

গৃ। তোমার কাছে ত সকলই ভাল। নিজে ভাল—তাই জগৎ ভাল।

ভ। আর কে বলেছে তোমায় যে ব্রাহ্মেরা মাছ খায় না? মাছ না খাওয়া কি হিন্দুর ধর্ম্ম নয়?

গৃ। ধর্ম্ম টর্ম্ম তত বুঝি না—এই টুকু বুঝি যে, ছেলে না বেগড়ায়। তুমি যাই বল, যাই কও, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। শরৎ আমার কথা শুনলে না? ওর কি সন্ন্যাসী হ'বার বয়স হয়েছে? ওর যখন এগার বছর বয়স, সেই সময়ে একদিন আমি নদীর ঘাটে ব'লে দি, 'বাবা, নদীতে সাঁতার কাটতে নাই।' আর, গেল বছর জামাই এসে ওর সঙ্গে নাইতে গেছেন—বল্লেন, 'শরৎ বাবু, এসনা একটু সাঁতার কেটে আসি।' ও বল্লে, 'না—মা একদিন বারণ করেছিলেন—সেই থেকে আমি সাঁতার কাটিনে।' জামাই হাস্‌তে লাগলেন—বল্লেন—'কবে মা বারণ করেছেন—আর আজও তাই মনে মনে ঠিক আছে।' সেই শরৎ—আমি নিজে মাছের ঝোল পাতে ঢেলে দিলাম, এ ছুঁলে না।

গৃহিণীর অপাঙ্গে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

শরতের কার্য্যে জননীর চক্ষের জল এই প্রথম বিসর্জ্জিত হইল।

শরৎ! তুমি দেখিলে না। এ জল কিন্তু সন্তানের সহস্র সৎকর্ম্মের বিরুদ্ধে সঞ্চিত হয়।

ভবতারণ বুঝাইলেন—"কেন তুমি অন্যায় অনুরোধ কর্ত্তে গেলে? ছেলের বয়স হয়েছে—বুদ্ধি হয়েছে—এখন ওর ইচ্ছা। এসব বিষয়ে সহ্য ক'রে থাকাই ভাল। কথাটা না বল্লে আর এ কষ্ট টুকু পেতে হ'ত না।"

গৃহিণী এবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এতক্ষণে তিনি স্বামীর সহানুভূতি পাইয়াছেন। হৃদয় আর ধৈর্য্য মানে কি?

ভবতারণ যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কহিলেন, "দেখ, ব্রাহ্ম হ'লেও এসে যায় না—হিন্দু হ'লেও এসে যায় না। মানুষ হ'লেই হ'ল। ভাল মন্দ সব সমাজেই আছে। এদিকে মালা টপ্ টপ্, ওদিকে পরের সর্ব্বনাশ, এমন লোকও ত আছে। মনটা ঠিক চাই। ভগবানে ভক্তি আর লোকের প্রতি ভালবাসা, এই জিনিষ - তবে সমাজ ছেড়ে যাওয়া, আমাদের ছেড়ে যাওয়া, ওর যদি তেমন মতি গতি হয়—যাবে। তুমি কাঁদলেও কিছু হবে না—আমি কাঁদলেও কিছু হবেনা। সংসারে কে কার? নিজের নিজের পথ দেখ। কার বা ছেলে, কার বা মেয়ে?"

গৃহিণীর এসব কথা যেন ভাল লাগিল না। তিনি ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।



ষষ্ঠ অধ্যায়।



বার ছুটি ফুরাইবার সাত আটদিন পূর্ব্বেই শরৎ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, পড়া এখন বেশী পড়িয়াছে। পড়ার কথা শুনিয়া বাড়ীতে কেহই আপত্তি করিলেন না। কিন্তু শরতের মা'র মনে ইহাতেও যেন এক খট্‌কা লাগিয়া গেল। এবারে শরৎ যে ক'দিন বাড়ীতে ছিলেন, তাহা যেন অন্যমনস্কের ন্যায় কাটাইয়াছেন। সর্ব্বদাই তিনি যেন কোন বিষয়ে চিন্তা করিতেন। বাড়ী যেন তাঁহার ভাল লাগিত না। পিতা, পিতৃব্য বা অগ্রজের কাছে তিনি অধিকক্ষণ বসিতে পারিতেন না। মাতার সহিত তেমন প্রাণ খুলিয়া নানা বিষয়ে কথা কহিতেন না। সেই মাছ না খাওয়ার দিন হইতেই শরতের জননী তাঁহার স্বভাবে পরিবর্ত্তন বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ভবতারণকে তিনি অনেকবার বলিয়া ছিলেন, "ছেলের মনে

রোগ জন্মেছে।" ভবতারণের প্রকৃতি বড়ই ধীর, তিনি কিছুতেই উদ্বেলিত হইবার লোক নহেন্। গৃহিণী পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বলায় তিনি কহিলেন, "ও কিছু না; বি, এ, টা পাশ করুক, ছেলের বিয়ে দাও, দেখ সব সেরে যাবে।"

ফলতঃ শরতের মনের ব্যারাম কতকটা এই সম্বন্ধেই বটে। বৈশাখ মাসে যে শরৎ বাড়ী আসিয়াছিলেন, অগ্রহায়ণ মাসে সে শরৎ বাড়ী আসেন্ নাই, ইহা নিশ্চয়। শরতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শরৎ এফ, এ, পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরে পড়িয়াছিলেন,—বি, এ, পড়িতে তিনি কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় যাইয়া কয়েক মাস মাত্র তিনি সুস্থ ছিলেন; তাহার পর হইতেই তাঁহার অল্প অল্প মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে রোগ উৎকট দাঁড়াইয়াছে। দেশের কিছুই আর শরতের ভাল লাগে না। দেশের সমস্ত আচার ব্যবহারই যেন তাঁহার কাছে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, পিতার স্নেহ, মাতার বাৎসল্য, ইহাও যেন আরও মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। আর বিবাহ—সে ত জীবনের এক মহাব্রত—তাহাতে পিতা মাতার—অধিকার—এ ত বর্ব্বর সমাজে ভিন্ন হইতেই পারে না। শিক্ষিত লোকে কথনই এ প্রথার প্রশ্রয় দিতে পারে না। শরতের মাথায় এইরূপ খেলিতেছিল। শরৎ স্থির করিলেন, দেশে বিবাহ হইতেই পারে না। দেশের বানরীর সহিত আমার মনের মিল হইবে কিরূপে? না আছে শিক্ষা, না জানে কথা কহিতে! লেখাপড়া জেনে মাথায় লাথি মারিলেও সহ্য হয়। নিজে দেখিব,

তবে বিবাহ করিব; ইহাতে যিনি চটেন চটুন, তা ব'লে পশুর সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হ'তে পারি না। মা বাপ ক'দিনের জন্য? স্ত্রী জীবনের সঙ্গিনী।

শরতের এখন এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার রোগ বর্ণনা করিলাম। রোগোৎপত্তির কারণ বলিবার প্রয়োজন আছে কি? শরৎ সহর ঘুরিতেছেন; বক্তৃতা শুনিতেছেন; থিয়েটার দেখিতেছেন। কোথা হইতে রোগ আসিল, কেমন করিয়া বলিব? এই টুকু বলিতে পারি যে, বাসার এক ঝি শরতের রোগ বাড়াইয়া দিতেছিল। শরৎ এক মেসে থাকেন; সেখানে দশ বারটি ছেলে। একটি মাত্র শরতের দেশের। সেটি ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম নগেন্দ্র। তিনি ভবতারণের পুরোহিতের ভাগিনেয়। তাঁহার সমস্ত ব্যয় ভবতারণ বহন করেন। নগেন্দ্রের মুখে শুনা যায়, এই ঝিকে বাসার আর কেহই দেখিতে পারিত না। শরৎ তাহাতে চটিতেন। নগেন্দ্র বড়ই মুখফোঁর; ঝি বাজারের পয়সা হইতে বড় বেশী চুরি করিত বলিয়া নগেন্দ্রের সহ্য হইত না। তিনি তাহাকে মিষ্টি মিষ্টি দু' চারি কথা শুনাইলে অন্য সকলেই সন্তুষ্ট হইত; শরৎ চটিতেন।

ঝি একদিন বাজার থেকে পটল এনেছে। পয়সা বেশী, পটল অল্প। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন, "ক' পয়সার পটল ঝি?" ঝি উত্তর করিলে, তিনি কহিলেন, "এই কটি পটল, তার দাম এই?"

ঝি বলিল,—"বাবু পটল কি আজকাল ছোঁওয়া যায়? সে দিনও দু' টাকা সের বিকিয়েছে। কিছু সস্তা হ'য়েছে, তাই তোমাদের জন্য এনেছি?"

ন। তা ঠিক, দেখ ঝি, কলকেতা সহর ব'লে তুমি পটল পেয়েছ—আমাদের পাড়াগাঁ অঞ্চলে এ সময়ে পটল কিনতে গেলে, কেবল পয়সা ক'টি নেয়, পটল দেয়ই না। এ সেপাই-শান্ত্রীর জায়গা, তাই তুমি ঐ ক'টি পেয়েছ!

ঝি মহা চটিয়া গেল।

শরৎ তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নগেন্দ্রকে কহিলেন, "এ তোমার কেমন বিদ্রূপ? ঝির সঙ্গে তোমার ও রকম কেন?"

ঝির প্রতি শরতের পক্ষপাত লইয়া, 'মেসে' সর্ব্বদাই আন্দোলন চলিত।

ঝির সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া, সে কিসে শরৎকে বাধ্য করিয়াছে, বলিতেছি। ঝির নাম রুক্মিণী।—বাড়ী মেদিনীপুর অঞ্চলে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কম নহে। ঝি একমাত্র কন্যা লইয়া কলিকাতায় আছে। কন্যাটি ঠন্ঠনিয়ার কালীবাড়ীর কাছে একটি খোলার ঘরে বাস করে। ঝি অবশ্য তপস্বিনী। সে শরৎদের বাসার বাজার-করা ঝি। যাঁহারা কলিকাতার এইরূপ মিশ্রিত বাসায় থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এইরূপ ঝির পরিচয় অধিক দিবার প্রয়োজন নাই।

ঝি শরৎকে বড়ই খাতির করিত। শরৎ বড়মানুষের ছেলে, ইহা মেসে থাকিলেও বুঝা যাইত। তিনি অবিবাহিত, ঝি ইহা

জানে। ঝি চেষ্টায় ছিল, কলিকাতায় শরতের বিবাহ-সম্বন্ধ করিয়া দিবে। অবসর পাইলেই ঝি আসিয়া শরতের কাণে মন্ত্র দিত। বাবা, পরীর মত মেয়ে, পা থেকে মাথা অবধি গয়না দেবে। সোণা দিয়ে ঢেকে দেবে। লেখাপড়ায় পাশ করা মেয়ের চাইতেও ভাল। গাইতে জানে, বাজাতে জানে। এমন নইলে কি সাজে তোমার সঙ্গে? ঝি প্রায়ই এইরূপ বক্তৃতা করিত।

কলিকাতা সম্বন্ধে শরতের অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। ঝি মধ্যে মধ্যে দুই একটি বড়লোকের নাম করিত। শরৎ গলিয়া যাইতেন। তিনি ভাবিতেন, ঝি কলিকাতার সমস্ত ভদ্রলোককেই জানে। ফলতঃ, কলিকাতার অধিবাসী ভদ্রলোকের গৃহে ঐ ঝির থাকা বা গতিবিধি সম্ভবেই না। কিরূপ স্থানে তাহার যাতায়াত ছিল, শরতের বিবাহেই তাহা প্রকাশ পাইবে। শরৎ চেষ্টা করিলে যে কোনও বুনিয়াদি ঘরে বিবাহ করিতে না পারিতেন, এমন নহে। কিন্তু ঝির মন্ত্রে তিনি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রূপতৃষ্ণা তাঁহার সমধিক প্রবল হইয়াছিল।





সপ্তম অধ্যায়।



ল্গুন মাসের অর্দ্ধেক চলিয়া গিয়াছে। বৈকাল বেলায় ভবতারণ বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন; এমন সময় শ্যামাচরণ সহসা নূতনগর হইতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। সে দিন তাঁহার আসিবার কোনও কথা ছিল না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই পুত্র পিতার চরণ বন্দনা করিলেন, এবং ভবতারণ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই কহিলেন, "বাবা, শরৎ এক চিঠি লিখেছে!!"

ভবতারণ ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছে ত?"

শ্যামাচরণ মনে মনে ভাবিলেন; ধন্য পিতামাতা, সন্তানের মঙ্গলকামনাই তোমাদের ব্রত!—

প্রকাশ্যে কহিলেন, "হাঁ আছে ভাল। তা'র বিবাহ কলিকাতায়—সে নিজেই ঠিক করেছে! এই মাসেই হবে।

তাই আমাদের সকলকে যেতে লিখেছে। লজ্জায় বোধ হয় আপনাকে কিছু লিখ্‌তে পারে নি।”

শরতের লজ্জা থাকুক আর নাই থাকুক, লজ্জার কারণ যথেষ্ট ছিল। অধিক দিনের কথা নহে, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বি· এ· পাশ না করিয়া আমি বিবাহ করিব না। বি· এ· পাশ করিবার কিন্তু এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

সত্যানুরোধে আমরা পাঠককে এ কথাও জানাইতে বাধ্য যে, শ্যামাচরণ ভ্রাতৃস্নেহের বলে চিঠির ভাব কিঞ্চিৎ গোপন করিয়াছেন। শরৎ নিজে চিঠি লেখেন নাই। চিঠি লিখিয়াছে সেই নগেন্দ্র,—সেই পুরোহিতের ভাগিনেয়। শরৎ এমন কথা বলেন নাই যে, ভবতারণ ও শ্যামাচরণ না গেলে, তাঁহার বিবাহ বন্ধ থাকিবে।—তবে সংবাদ দিয়াছেন মাত্র। নগেন্দ্রকে চিঠি লিখিতে তিনিই বলিয়াছেন।

ভবতারণ, “শরতের বে—নিজেই ঠিক করেছে” এই বলিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।—পরে কহিলেন, “মেয়ে কার?”

শ্যা। প্রিয়নাথ মিত্রের। তিনি কলিকাতাতেই কর্ম্ম করেন। তাঁর ঐ একটি মাত্র কন্যা। টাকা শ’ দেড়েক মাইনে পান। কলিকাতায় দু’খানি বাড়ী আছে। মেয়েটি পরিষ্কার, ডাগরও বেশ। শরৎ নিজে দেখেছে।

ভ। নিজে দেখেছে বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কি জান বাবা, মেয়ের বাইরের রূপ বড় দেখ্‌বার জিনিস নয়। লক্ষণ-অলক্ষণ-

গুলি দেখাই দরকার। সংসারে স্ত্রীলোকই লক্ষ্মী; স্ত্রীলোকই অলক্ষ্মী। স্ত্রীলোক ভাল হ'লে, অতি দুঃখের সংসারেও সুখ হয়—আবার মন্দ হ'লে, সোণার সংসারও ছারখারে যায়। বাপ খুড়ো কি অন্য বুড়োরা মেয়ে দেখ্‌বে, এ রীতি কেন? তাদের অভিজ্ঞতা অনেক, তা'রা ঠিক দেখ্‌বে ব'লে। তোমার বে'র সময় আমি কেবল মেয়েটি দেখে আর, কিছুই দেখ্‌লেম না। যা'ক—শরৎ ঠিক ক'রে ফেলেছে - জগদীশ্বর তারে সুখী করুন্—আমাদের একবার জিজ্ঞেস ক'ল্লে পার্‌ত!

ভবতারণ এই কথা কয়েকটি যে ভাবে কহিলেন, তাহাতে শ্যামাচরণ, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা দূরে থাকুক, পিতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেও পারিলেন না। শরতের কার্য্যের জন্য যেন তাঁহার লজ্জা এবং ক্ষোভ হইল। তিনি অধোবদনে রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে ভবতারণ কহিলেন, "বাড়ীর ভিতরে বলিতে গেলেই গোল হবে। প্রেমচাঁদ শুন্‌লেও অমত ক'রবে। সে ত বাড়ীতে নাই।"

শ্যামাচরণ, কথা কহিবার সুযোগ পাইলেন।—কহিলেন, "মার ও কাকা বাবুর মত হবে এখন।—যাই আমি মাকে ডাকি।"

শ্যামাচরণ বাড়ীর ভিতরে যাইয়া, মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভবতারণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, এবং মনে মনে গৃহিণীর নিমিত্ত ঔষধ ঠিক করিতে লাগিলেন।

গৃহিণী; শ্যামাচরণ এবং ভবতারণ একত্র হইলে, শ্যামাচরণ কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই, ভবতারণ কহিলেন, "দেখ, শরতের বে!"

গৃ। কোথায়?

ভ। কলিকাতায়!

গৃ। কলিকাতায়! কে ঠিক ক'ল্লে?

গৃহিণীর মুখ রক্তিম হইয়া আসিয়াছে।

ভ। সে নিজেই!—

গৃহিণী পাছে কিছু বলিবার অবকাশ পান, এই ভাবিয়া ভবতারণ এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধ প্রয়োগ করিলেন—

"সেই ঠিক করুক, আর যেই করুক, এতে তোমার মত দিতেই হ'চ্ছে—শুভ কর্ম্ম!—তুমি যদি একটি নিশ্বাস ফেল – তা'তেও ছেলের অমঙ্গল হ'তে পারে। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, যিনি ঘরে আস্‌ছেন, তিনি সুখী হ'ন!"

"ছেলের অমঙ্গল" কথাটি যেন বিদ্যুদ্বেগে গৃহিণীর শিরায় শিরায় প্রবেশ করিল। সহসা তাঁহার মূর্ত্তিতে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, "তুমি মত দিয়েছ?"

ভ। না দিয়ে কি তোমায় অনুরোধ কচ্ছি?

গৃ। তা আমিও দিলাম। মেয়েটি কেমন?

ভ। মেয়ে সুন্দরী।

গৃ। ঘর কেমন?

ভ। ভালই হবে বোধ হয়। শ্যামাচরণকে কল্‌কাতায় পাঠাচ্ছি, একবার সব দেখে শুনে আস্‌বার জন্যে।

গৃ। কলিকাতায় বে করা ওর ইচ্ছে, আমি তা আগে থেকেই জানি, ওতে আর বাঁধা দিয়ে কি ক'রব?

গৃহিণী অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ভবতারণ শ্যামাচরণকে কহিলেন, "আচ্ছা তা'রা কি ব'লে ঠিক ক'ল্লে বে? একবার ত খোঁজও ক'ল্লে না যে, ছেলের দেশ কোথায়—বাড়ী ঘর দোর আছে কি না? শরৎ যেন তোমার ভাই। মনে কর, যদি আমাদের রামা খান্‌সামার ভাই কলিকাতায় প'ড়ত, তা'রা তা'কেও ত মেয়ে দিত!

শ্যা। আজকাল জাতি-কুলই লেখা-পড়া!

ইহার পর দিনেই শ্যামাচরণ কলিকাতায় গেলেন। সেখানে দেখিয়া আসিলেন, ভাবী ভ্রাতৃবধূর রূপ আর প্রিয়নাথের ভদ্রতা। বস্তুতঃ এতদুভয়ই যথেষ্ট ছিল। প্রিয়নাথ যে কুলীন কায়স্থ, ইহাতেও তাঁহার সন্দেহ রহিল না। কন্যার মাতুলকুল সম্বন্ধে শ্যামাচরণ কোনও প্রশ্নই করেন নাই, আর নিকট-প্রতিবেশী-দিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিতেন যে, প্রিয়নাথ মিত্রের স্ত্রীই অনেক বিষয়ে তাঁহার স্বামিস্বরূপা। শ্যামাচরণ একদিনমাত্র অবস্থিতি করিয়া, এ সব তত্ত্ব কেমন করিয়া সংগ্রহ করিবেন? তিনি বাড়ী ফিরিয়া ভবতারণকে যাহা বলিলেন, ভবতারণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। বিবাহ স্থির হইয়াছে। আমোদ-উৎসবের ত্রুটি রহিল না। ভৃত্য এবং

দরিদ্রকে বস্ত্রদান প্রভৃতি রীতিমত হইল। প্রেমচাঁদের মাতা শ্যামাচরণকে কখনও ঘটক, কখনও কুটুম্ব সাজাইয়া, যথেষ্ট আমোদ করিলেন। কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। সুরবালাকে আনিবার জন্য নৌকা প্রেরিত হইল। শ্যামাচরণের স্ত্রী এবং প্রেমচাঁদের জননী ব্যতীত বাড়ীর সকলেই যাইবেন, স্থির হইয়া গেল। ফলতঃ, শরতের বিবাহের পূর্ব্বে, কলিকাতায় কন্যাকর্ত্তার বাড়ী অপেক্ষা, বাজিৎপুরে আমোদ-কোলাহল অনেক অধিক হইল।





অষ্টম অধ্যায়।



লা চব্বিশ পরগণার কোনও পল্লীগ্রামে প্রিয়নাথ বাবুর আদি বাড়ী। তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কেদারনাথের কাল হইয়াছে। কেদারনাথ কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেন। প্রিয়নাথকে তিনিই লেখাপড়া শিখান, এবং কলিকাতায় তাঁহার বিবাহ দেন। সে সময়ে কলিকাতায় ইঁহাদের স্থায়ী বাসভবন ছিল না। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর প্রিয়নাথ স্ত্রীর পরামর্শে সহরে বাড়ী করিয়াছেন। কেদারনাথের বিধবা সহধর্ম্মিণী পল্লীগ্রামস্থ সেই সাবেক বাড়ীতেই আছেন। তাঁহার তিনটি কন্যা। তাঁহারা সকলেই পাত্রস্থ হইয়াছে। স্ত্রীর সাক্ষাতে প্রিয়নাথ তাহাদের কাহারও নাম মুখে আনেন না। কিন্তু, আমরা জানি, তিনি স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে কেবল তাহাদের সংবাদ লন, তাহা নহে—প্রয়োজনমত অর্থসাহায্যও করিয়া থাকেন। এ

ছাড়া ছুটির সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে দেশে যান। বিধবা ভ্রাতৃবধূ ইহাতেই দেবরকে কত আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

কলিকাতার বাড়ীতে প্রিয়নাথের স্ত্রী এবং কন্যা আর তাঁহার দেশের একটি দরিদ্রা প্রৌঢ়া রমণী আছেন। রন্ধনাদি কার্য্য ইঁহা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইনি দূরসম্পর্কে প্রিয়নাথের পিশি। আপনার গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন, তিনি প্রিয়নাথ বাবুর নিকট আর কিছুই পান না। গৃহিণী কিন্তু তাঁহাকে বেতনভোগিনীপাচিকার ন্যায় ভাবেন, এবং স্বামীর অসাক্ষাতে সময়ে সময়ে তাঁহার প্রতি বেশ কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। প্রিয়নাথ তাঁহাকে রীতিমত ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। অনাথা রমণী ইহাতেই সন্তুষ্ট। বধূর দুর্ব্যবহারের কথা প্রিয়নাথকে জানান তিনি কখনও আবশ্যক বোধ করেন না। প্রিয়নাথের সাক্ষাতে, কপট হইলেও, গৃহিণী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম দেখাইয়া থাকেন।

ফলতঃ প্রিয়নাথ এবং তাঁহার স্ত্রীর প্রকৃতি প্রায় বিপরীত হইলেও উভয়ে যেন একরূপ মিট্‌মাট্ হইয়া গিয়াছে। প্রিয়নাথ স্ত্রীর কথা খুব শুনেন, কিন্তু এমন বিষয়ে নহে, যাহাতে তাঁহাকে আপন কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইতে হয়। স্ত্রীও তাঁহাকে বাধা দিতে ভয় করেন, এবং যাহাতে তাঁহার কথা টিকিবে না, এমন কাজে কথাই কহেন না। একবার প্রিয়নাথ বাবুর ভ্রাতৃবধূর একখানি চিঠি তাঁহার স্ত্রীর হাতে পড়ে। ঐ পত্রে অর্থসাহায্যপ্রার্থনা ছিল। গৃহিণী তাহাতে বড়ই কুপিতা হন, এবং স্বামীকে কহেন, "দেশের যা কিছু সব লুটে খাচ্ছেন, আবার এখান থেকে

টাকা!" প্রিয়নাথ ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং রুক্ষভাবে স্ত্রীকে স্পষ্টতঃ জানাইয়া দিয়াছিলেন, "টাকা আমি আনি। যাহাকে যাহা দিতে হয়, আমি জানি। ইহাতে কথা কহিলে ভাল হইবে না!" ইহার পর গৃহিণী স্বর ছোট করিলেন, এবং মুঁখ ভারি করিয়া কহিলেন, "তা, টাকা তোমার বই কি? যাকে ইচ্ছা তা'কে দিবে, আমার কথা কি? এই বলিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন।, প্রিয়নাথ এ ভারি মুখ দেখিতে ইচ্ছা করেন না, বরং যতদূর সাধ্য পরিহার করিবার চেষ্টা করেন। তাই তিনি তদবধি বাড়ীর যা কিছু সাহায্য করেন, সমস্তই গৃহিণীর অজ্ঞাতে। প্রিয়নাথপত্নী না বুঝিতে পারেন, এমন নহে; কিন্তু তিনি যেন বুঝিয়াও বুঝেন না, জানিয়াও জানেন না।

এ দিকে কলিকাতার বাসায় গৃহিণীর প্রভুত্ব অসীম। প্রিয়নাথ কিছুতেই হাত দেন না। যা করেন গৃহিণী। পিশির প্রতি দুর্ব্ব্যবহার হয়, পরোক্ষে ইহা জানিতে পারিলেও, প্রিয়নাথ ঘাঁটাইয়া কথা তোলা অপ্রীতিকর মনে করেন, এবং যতদূর সম্ভব, আপনার সদ্ব্যবহারে বৃদ্ধাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন। অন্যান্য ক্ষুদ্র বিষয়ে, অর্থাৎ জিনিষপত্র কেনা-বেচা বা চাকর-চাকরাণী বহাল বর্‌তরফ্‌ ইত্যাদি বিষয়ে গৃহিণীর হুকুম চূড়ান্ত। প্রিয়নাথ তদ্বিরুদ্ধে কখনও একটি আপিল গ্রাহ্য করেন নাই!

স্থূল কথা এই যে, প্রিয়নাথ স্বভাবতঃ ভালমানুষ। কলহ বা সংঘর্ষণ তিনি ভালবাসেন না, এবং যত দূর সাধ্য, স্ত্রীর বিরক্তি উৎপাদনে বিরত থাকেন। স্ত্রী তাঁহার দেশে যাইতে অনিচ্ছুক।

প্রিয়নাথও অগ্রজের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের সময় ব্যতীত তাঁহাকে আর কখনও সে অনুরোধ করেন নাই। কাজ কি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে দেশে লইয়া যাইয়া? আবশ্যক হইলে, তিনি নিজে যাইতেন। প্রিয়নাথ যাহাই করেন, তাহা তাঁহার নিজের স্বভাবের গুণে, বা অনৈক্যপরিহারার্থ। গৃহিণীর যে ভালমানুষী, সে কেবল কারে পড়িয়া, অথবা স্বামীর ভয়ে!

এ অবস্থায়, একমাত্র কন্যার বিবাহ কে দিবে? বলা বাহুল্য যে, প্রিয়নাথের স্ত্রীর ইচ্ছাই এ সম্বন্ধে বলবতী। জন্মাবধি কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া, একমাত্র মাতার শিক্ষানুবর্ত্তিনী হইয়া চলায়, কন্যাটিতে মাতৃদোষ সম্পূর্ণ অর্শিয়াছিল। পিতৃকুলের সম্পর্ক ছিল কেবল নামটিতে। কেদারনাথের তিন কন্যার নাম যথাক্রমে সত্যবতী, গুণবতী ও পুণ্যবতী। প্রিয়নাথের স্ত্রী অসামান্য উদারতা দেখাইয়া "বতীর" মিলে কন্যার নাম রাখিয়াছেন রূপবতী। গৃহিণী স্বামীকে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন, তোমার তিন ভাইঝির বিবাহ তুমি দিয়াছ। আমার কন্যার বিবাহ আমি দিব। প্রিয়নাথের ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিবার কারণ ছিল না।

গৃহিণীর বরাবর ইচ্ছা, তিনি সহরের একটি ছেলের সহিত কন্যার বিবাহ দেন। পাড়াগেঁয়ের নামে তাঁহার গায়ে জ্বর আসিত, কিন্তু সংপ্রতি তাঁহার ভাই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আজকাল পাড়াগেঁয়ে ছেলেই ভাল। তাদের পয়সার খাঁকতি কম, আর ছেলেও প্রায় খারাপ হয় না। এ কথা প্রিয়নাথ

বলিলে, গৃহিণী নাক সিঁট্‌কাইতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যখন ভাই বলিয়াছেন, তখন ইহার মুল্য আছে। এই গুণবান্ ভ্রাতার সহিত পাঠকের পরে পরিচয় হইবে। ভাইএর কথা শুনিবার পর, যে দিন এক ঘটকী আসিয়া শরতের কথা বলিল, গৃহিণী সেই দিনই প্রায় অর্দ্ধেক মত দিয়া ফেলিলেন। তার পর, শরৎকে বাড়ীতে আনা হইয়াছে। তিন চারি দিন শরৎ আসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। রূপবতীকে দেখান হইয়াছে, শরতের স্বভাব এবং তাহার লেখাপড়ার বিষয় শুনিয়া ও রূপ দেখিয়া, গৃহিণী বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইতিমধ্যে যেরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, বিবাহ হইয়া গিয়াছে! সপ্তাহে দুই তিন বার শরতের বাসায় লোক যায়—কখন কখন ভাবী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রস্তুত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া—কখনও বা রূপবতীর হাতের বোনা শরতের পায়ের এক যোড়া মোজা লইয়া। শরৎ মনে করিতেছেন এ বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া যাইবে!

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এ অধ্যায় শেষ করিব। কথাটা সামান্য—কিন্তু অতিশয় মর্ম্মভেদী!

প্রিয়নাথবাবুর বাড়ীতে শরৎ যে দিন প্রথম জলযোগ করেন, সেই দিন প্রিয়নাথের স্ত্রী ভাজামাছের সুন্দর কচুরি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শরৎ চিনিতে না পারিয়া, উহাতে এক কামড় দিয়াই আর স্পর্শ করিলেন না। গৃহিণী ঝিকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইলেন, কচুরি খাচ্ছেন না কেন? শরৎ মাথা হেঁট করিয়া উত্তর দিলেন, আমি মাছ খাই না।

"ওমা সে কি গো! সাত নয়, পাঁচ নয়, আমার এক রূপবতী, চিরকাল বরের পাতে ভাত খাবে—মাছ খাবে না, সে কি কথা গা?" বলিয়া রূপবতীর জননী কিঞ্চিৎ দূরে চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া মিহি সুরে শরতের শ্রুতিতে এতটা করুণ রস ঢালিয়া দিলেন যে, তাহা শ্রবণবিবর দিয়া আসিয়া, শরতের হৃদয় একবারে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। না ফেলিবেই কেন? নিম্ন দিকেই জল যায়। ঘোষবংশের সুপুত্র ভাবিলেন, যা! এই অল্প কথার জন্যেই বা সব মাটী হয়! একবারমাত্র চারি দিক্ চাহিয়া দেখিলেন, এবং অবিলম্বে সেই ভাজামাছের ক্ষচুরিরাশি প্রায় সমস্ত উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন!

শরৎ! খুব খাও! চারি দিকে চাহিবার প্রয়োজন কি? ভবতারণ ঘোষের গৃহিণী সেই দশ যোজন দূরে বাজিৎপুরেই আছেন। সেখানে এ সংবাদ কে লইয়া যাইবে?





নবম অধ্যায়।



বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর গৃহে কন্যার জন্ম পিতার পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল বলিয়া পরিগণিত। কন্যার জন্ম কোনও কালেই কোনও জাতির কাছে সুখের বিষয় ছিল না। প্রবাদ আছে যে, কোনও এক মুসলমান সম্রাটের এক কন্যা হইলে, অন্তঃপুর হইতে সভামধ্যে যেমন তাঁহার নিকট সংবাদ পঁহুছে, তিনি অমনি মস্তক হইতে উষ্ণীষ উত্তোলন করিয়া ভূমিতে রাখিয়া দেন! সমাগত সভাসদদিগের এক জন ইহার কারণজিজ্ঞাসু হইলে, সম্রাট কহিলেন, অদ্য হইতে এমন একজন লোকের কথা ভাবিতে হইল, যাহার কাছে এই শিরস্ত্রাণ নত করিতে হইবে! বলা বাহুল্য, তিনি ভাবী জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা কহিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে এখনও কন্যাসম্প্রদানের সময় "বরায় অর্চ্চিতায়" এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। 'গোমূর্খায়' হইলেও মন্ত্র যেমন তেমনই থাকিবে।

এই অর্চ্চনা ঘুচাইবার জন্যই সে দিন পর্য্যন্ত—পঞ্জাবে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কন্যা-হনন-প্রথা প্রচলিত ছিল। অধুনা, রাজবিধির বলে, এই পাপ-প্রথা তিরোহিত হইয়াছে সত্য,—কিন্তু এখন কার্য্যতঃ কন্যা-হনন সম্ভবপর না হইলেও, অনেকে মনে মনে দুহিতার মৃত্যুকামনা করিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চয়। যাঁহাদের আর্থিক সচ্ছলতা নাই, অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যু তাঁহারা অনেক সময়ে মঙ্গলের বিষয় মনে করিয়া থাকেন। আজি কালি একটি কন্যার বিবাহে যে রজতরাশি ব্যয়িত হইয়া থাকে, অধিকাংশ স্থলে তাহার ওজন কন্যার ওজন অপেক্ষা অধিক! এমন অবস্থায় লোকে অবিবাহিত কন্যার মৃত্যুকামনা করিবে না কেন?

আমাদের কোনও বন্ধু, মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে, এক সামান্য চাকরি করিয়া, কথঞ্চিৎ আপনার এবং পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিয়া থাকেন। বন্ধুর গায়ের রংটি কিঞ্চিৎ মলিন। বন্ধু বলিয়াই কিঞ্চিৎ বলিলাম। অন্য কাহারও হাতে সে বর্ণের বর্ণনার ভার পড়িলে, তিনি বলিতেন যে, অমানিশার অন্ধকারে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে, বস্ত্র অথবা বাক্য ব্যতীত, বন্ধুর অস্তিত্ব অনুমিত হওয়া অসম্ভব! ভাগ্যক্রমে তাঁহার গৃহিণীও জলধরের জগদম্বা বটেন। দম্পতি একত্র দণ্ডায়মান থাকিলে, উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ণয় করা, দর্শনেন্দ্রিয়ের পক্ষে, বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠে! এ হেন সাধু-সংমিশ্রণে প্রথমতঃ দুইটি কন্যার উৎপত্তি হয়। দুহিতৃদ্বয় বর্ণ-বিষয়ে পিতা-মাতা অপেক্ষা কিঞ্চি-

মাত্রও উন্নতিলাভ করে নাই। যখন প্রথমার বয়স পাঁচ বৎসর এবং দ্বিতীয়া কেবল দুই বৎসরের, সেই সময়ে সহসা বিসূচিকা রোগে তাহারা দুই ভগিনী অকালে প্রাণত্যাগ করে।

বন্ধু তাসখেলা বড় ভালবাসেন। এ ক্রীড়ায় নৈপুণ্য তাঁহার বিলক্ষণ আছে, কিন্তু ভাগ্য এমনই যে, জয় তাঁহার পক্ষে প্রায়ই ঘটে না, খেলিবার ইচ্ছা কিন্তু বড়ই প্রবলা। খেলিবার নিমিত্ত তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান, এবং অনেক সময়ে অন্যের কার্য্যের ক্ষতি করিয়াও জোর করিয়া টানিয়া বসান।

কন্যাদ্বয়ের মৃত্যুর পর সপ্তাহমাত্র অতীত হইয়াছে। বন্ধু তাস খেলিতে বসিয়াছেন। সে দিন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব জিত্ হইল। বলা বাহুল্য, খেলায় জিতিলে অন্যের যে আমোদ হয়, তাঁহার তদপেক্ষা শতগুণ অধিক; কেন না, শত দিনে এক দিনও তিনি এ আমোদ উপভোগ করিতে পান কি না সন্দেহ! পূর্ব্বোক্ত দিনের শেষ জিতের পর খেলাভঙ্গ হইলে, বন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইয়া নানা প্রকারে জয়গর্ব্ব ঘোষণা করিতে লাগিলেন, এবং সে সময়ে বিপক্ষ পক্ষকে উদ্দেশ করিয়া অম্লানবদনে বলিয়া ফেলি-লেন, "হাঁ, হাঁ, আমার সঙ্গে খেলায় জিৎবে আজ? আজ বল্‌তে কাল ওলাউঠা এক দিনে আমার দু দুটো পাথুরে মেয়ে পার ক'রে দিয়েছে, বুঝতে পাচ্ছ না কপাল?"

বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, ইহা পরিহাস নহে, মনের আবেগে প্রাণের কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিকই

সে কালো কন্যা দুটিকে পাত্রস্থ করিতে হইলে, বন্ধুর পৈতৃক ভদ্রাসনটুকু পর্য্যন্ত বিক্রীত হইত।

এ ত গেল দরিদ্রের কথা—যাহাদের অর্থের সচ্ছলতা নাই, তাহাদের কথা। যাহাদের ধন আছে, তাহাদেরই বা কি? সর্ব্বাংশে সমান বর ক'টি মিলে? বেশ লেখা-পড়া-জানা দেখিয়া একটি ছেলেকে একটি কন্যা দিলাম। তাহার লেখাপড়া লেখা-পড়াই রহিল। পুরস্কার যাহা হইয়াছে বিবাহের সময়ে। দাসত্ব তাহার জুটিল না। কন্যা চিরদিন কষ্টে কাটাইল। এইবার মনে করিলাম, দ্বিতীয়া কন্যাকে এমন কাহারও হাতে দিব, যাহার কিছু পৈতৃক বিভব আছে। তাহাই দেওয়া হইল। মূর্খ জামাতা ঘোর অবিবেকী! কুসংসর্গে পড়িয়া, তাহার চরিত্র কলুষিত হইল; অল্পদিনেই পিতৃসম্পত্তি সমস্ত গেল। দুঃস্বভাব দরিদ্রতায় মিশিল। কন্যার দুঃখের আর সীমা রহিল না। এবার ভাবিলাম, তৃতীয় কন্যাকে এমন দেখিয়া দিব যে, জামাতার বয়স হইয়াছে, চরিত্র পরীক্ষিত হইবার সময় গিয়াছে, অথচ কিছু কিছু উপার্জ্জনও আছে। সহজেই এমন এক দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের বর মিলিল। কিন্তু সপত্নীপুত্রের পীড়ন কন্যার পক্ষে অসহ্য হইল, অথবা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বিষহ, তাহাই ঘটিল; অল্প দিনেই কন্যার বৈধব্য উপস্থিত হইল। এ ত সমস্তই জামাতাকে লইয়া। এ ছাড়া কন্যার শাশুড়ীর কর্কশ স্বভাব, শ্বশুরের অভদ্র ব্যবহার প্রভৃতি পিতা মাতার অসুখের ক্ষুদ্র হেতু এত আছে যে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আজকালের বাজারে কন্যার পিতা বন্ধকী

তমঃশুকের খাতক। বৈবাহিক তা'র মহাজন। তাই বলিতে-ছিলাম, কন্যার জন্ম পিতার পাপের ফল!

পাঠক! এই সুদীর্ঘ পূর্ব্বাভাষের অর্থ অবশ্যই অনুমান করিয়াছেন। ভবতারণের একমাত্র কন্যা সুরবালার কপালে সুখ নাই। শ্বশুরালয়ে যাইয়া অবধি একদিনের নিমিত্ত তিনি স্বামীর আদর পান নাই। পিতা-মাতার আদরের ধন সুরবালা স্বামিগৃহে অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছেন।

সুরবালা এখন আর সে সুরবালা নাই। শ্বশুরালয়ে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে শরৎ তাহার চুল সমান করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সুরবালা অনেক স্ত্রীলোকের চুল বাঁধিয়া দেন। সুরবালা নিজে একটি সংসার চালাইতেছেন। কিরূপে সংসারের ভার তাহার স্কন্ধে পড়িয়াছে, পরের অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে।

সেদিনকার মেয়ে সুরবালা আজি গৃহিণী! এ অভিজ্ঞতা তাঁহার কোথা হইতে আসিল? পিত্রালয়ে তাঁহাকে এক দিনের জন্যেও সংসারের ভার বহিতে হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজকর্ম্ম তিনি সময়ে সময়ে অবশ্যই করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই সাংসারিক জ্ঞান জন্মে কি? বঙ্গগৃহের অভ্যন্তরে যাঁহারা দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে দিন কন্যা পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরভবনে গমন করে, সেই দিনই তাহার জীবনে দশান্তর উপস্থিত হয়। এক ঘটনাতেই যেন তাহার বুদ্ধি এবং কার্য্যক্ষমতার বিকাশ হইয়া পড়ে। কা'ল যাহাকে বালিকা বলিয়া

বোধ হইয়াছে, আজ তাহার গৃহিণীপণা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমাদের বিশ্বাস এই যে, পিতৃগৃহে থাকিতে থাকিতেই বুদ্ধিমতী বালিকা তাহার শিক্ষা সমাধা করিয়া লয়। বালক অপেক্ষা বালিকার অনুকরণ প্রবৃত্তি অধিক প্রবলা। মাতা যাহা করিতেছেন, কন্যা নিবিষ্ট মনে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছে। জ্ঞান হইবামাত্রই সে আপনার মানসরাজ্যে এক কাল্পনিক সংসার স্বজন করিয়া লয়, এবং মনে মনে সর্ব্বদা সেই সংসারের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকে। পরিচয় দিবার নিমিত্ত অবশ্য "বি, এ," "এম্, এ,"র মত পরীক্ষা নাই, সুতরাং সে আভ্যন্তরিক উন্নতি কেহই লক্ষ্য করিতে পারে না। কোনও নূতন গৃহ প্রস্তুত হইবার সময়ে যেমন তাহার উপরিভাগ খড়, কুটা, ইট্, কাঠ, প্রভৃতি আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত থাকে, কন্যার সাংসারিক অভিজ্ঞতাও পিতৃভবনে তেমনি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহে। এখানে সেই আবর্জ্জনা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রভৃতির আদর। আবর্জ্জনা ফেলিয়া দাও, শ্বশুরগৃহে দেখিবে পরিষ্কার নূতন ঘর। অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আমরা এমন কন্যার কথা বলিতেছি, যাঁহার জননী সংসারবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, এবং গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা অভ্যস্ত। বঙ্গের পল্লীগ্রামে বাঙ্গালীর গৃহে এখনও এমন জননী অনেক আছেন। ভবতারণের গৃহিণী ত এ শ্রেণীর এক আদর্শ মহিলা। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, তিনি সুরবালাকে শরতের পা ধুইবার জল আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ঘোষগৃহে দাস দাসী নাই, এমন নহে। কিন্তু অগ্রজের পাদপ্রক্ষালন নিমিত্ত একটু জল আনয়ন অনুজার পক্ষে

অবমাননার কথা নহে। বস্তুতঃ, বঙ্গমহিলার গৃহকর্ম্ম কি ঘৃণার চক্ষে দেখিবার জিনিস? যাঁহারা বলেন, হিন্দুগৃহে রমণীরা কেবল দাসীর ন্যায় পুরুষের সেবা করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করিতে পারি না। গৃহিণী স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া পতি, পুত্র, অতিথি, প্রভৃতিকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে-ছেন, অথবা ভ্রাতা মধ্যাহ্ন-আহারে বসিয়াছেন, গ্রীষ্মাধিক্য প্রযুক্ত তাঁহার শরীরে স্বেদ ঝরিতেছে, ভগিনী স্বেদাপনোদন জন্য নিকটে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছেন,—এ দৃশ্য কি উপহসিত হইবার সামগ্রী? অথচ দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত হিন্দু গৃহেও ইহা দেখিতে পাইবে। বঙ্গের মধ্যবিদ্গৃহে পাচক ব্রাহ্মণের প্রচলন অধিক দিন হয় নাই! কিছু দিন পূর্ব্বে দেশের অধিকাংশ স্থলেই রন্ধননৈপুণ্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে এ ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

বস্তুতঃ, বঙ্গললনা রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করিয়াও পূজিতা ভিন্ন পদদলিতা নহেন। রমণীই ত আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! পুরুষকে সর্ব্বদা কঠোর সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়; নারী তাহার কোমলতর অংশ লইয়া ব্যাপৃত। পুরুষ বাহির হইতে মাথামোটে বোঝা আনিয়া দিবেন; রমণী তাহা গুছাইবেন, সাজাইবেন, ব্যয় করিবেন, সঞ্চয় রাখিবেন। বাহিরের পরিশ্রম যাহা কিছু, পুরুষ করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা রমণীর নিকট চাহেন কেবল তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন, পীড়ায় শুশ্রূষা, বিষাদে সান্ত্বনা।

এ সেবা স্বর্গীয় সুখে সমাবৃত! কে না জানে হিন্দুর দান, ধ্যান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি পুরুষ অপেক্ষা রমণী কর্ত্তৃক অধিক সম্পাদিত হয়? নারীর প্রতি পুরুষের ভক্তিশ্রদ্ধাও ইহা অপেক্ষা কোনও সমাজে অধিক আছে কি? গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হউক, আপনাকে বিষম বন্ধন অথবা দারুণ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হউক, সে গ্রাহ্য করিবে না। কিন্তু তাঁহার গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ললনার কেশাগ্র স্পর্শমাত্র করিলেই মৃতদেহে বল আসিবে। রমণীই ত তাঁহার সম্মানের আধার, সে আধারে আঘাত করিলে, আর রক্ষা নাই। গৃহদেবতার অঙ্গস্পর্শ বা অবমাননা হইলে, নির্জীব বাঙ্গালী এখনও নরশোণিতপাতে উদ্যত হইয়া থাকে। "নারীহত্যা মহাপাপ" ইহা হিন্দুশাস্ত্রের কথা, ঘোর মূর্খ অথবা অবিবেকী না হইলে, নারীর গাত্রে কেহই হাত তুলিবে না। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, এ সম্বন্ধে নারী গোব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্ভূত, এবং ঐ দ্বন্দ্বের প্রথমের সহিত তাহার সমতা হওয়াই ঠিক। কিন্তু যেখানে রমণী পূজিতা, দেবগণ তথায় বাস করেন, * আর্য্যদিগের এ কথার বোধ হয় কোনও কদর্থই হইতে পারে না।

* "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"





দশম অধ্যায়।



রবালার স্বামীর নাম আশুতোষ বসু। বাড়ী কুলগ্রামে। আশুতোষের পিতা ধর্ম্মদাস বসু এক জন বিষয়ী লোক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি যে বিভব রাখিয়া যান, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে, আশুতোষকে অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে হইত না। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান। ধর্ম্মদাস কৃপণ স্বভাবের লোক ছিলেন। পুত্রের প্রকৃতি বিপরীত। যে সময়ে পিতার মৃত্যু হয়, তখন আশুতোষের বয়ঃক্রম বিশ বৎসর। সে আজি দশ এগার বৎসরের কথা। সুরবালার বিবাহ হইয়াছে পাঁচ বৎসরের উপর। সুরবালা আশুতোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আশুতোষ কুলীন সন্তান। প্রথমতঃ কুল করিবার নিমিত্ত এক পীড়িতা বা অর্দ্ধমৃতা বালিকার সহিত

তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর হইতে সে কেবল মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আশুতোষের মাতার যত্নে এবং সুচিকিৎসকের চিকিৎসার গুণে সে কয়েক বৎসর মাত্র বাঁচিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর এক বৎসরের মধ্যেই সুরবালার, সহিত আশুতোষের বিবাহ হয়। আশুতোষ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, এবং দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিলেন। শরতের সহিত কৃষ্ণনগরে তাঁহার পরিচয় হয়। শরৎই এ বিবাহ স্থির করেন। শরতের মুখে আশুতোষের প্রশংসা না শুনিলে ভবতারণ তাঁহার একমাত্র কন্যাকে দ্বিতীয় পক্ষের বরে দিতেন না।

সুরবালার শ্বাশুড়ী সে দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহারই পীড়ার সংবাদ পাইয়া বৈশাখ মাসে সুরবালা শ্বশুরবাড়ী যান। সেই পীড়াই সাংঘাতিক হইয়া উঠে, এবং গৃহিণী তাহাতেই প্রাণত্যাগ করেন। সুরবালা সেই হইতে শরতের বিবাহের সময় পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ীতেই আছেন। এই আট দশ মাসের মধ্যে স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কেবল সেই প্রথমে যাহা ঘটিয়াছিল। আশুতোষ বাঁকুড়া জেলায় চাকরী করেন। পূর্ত্তবিভাগে তাঁহার কর্ম্ম। মাসিক ১২০৲ টাকা বেতন, এবং তদ্ব্যতীত পাথেয় প্রাপ্তি আছে। মাতার পীড়ার সংবাদে তিনি বিদায় লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছিলেন; এবং শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত বাড়ীতেই ছিলেন। শ্রাদ্ধের পর সকলেই ভাবিয়াছিল, আশুতোষ স্ত্রীকে হয় সঙ্গে করিয়া কর্ম্মস্থলে লইয়া যাইবেন, নয় তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি কিন্তু এ দুইএর কিছুই করিলেন

বসিয়া আছে; শ্যামাচরণ রাস্তা দিয়া যাইতেছে। বামা বলিল, "শ্যাম, বাবা, ধরত এই কুড়ুলখানি; আমার এই বাঁশটায় একটা কোপ দিয়ে দাও। তোমার হাতের কতক্ষণের কাজ লক্ষ্মী! বাপ আমার?" শ্যাম হৃষ্ট অন্তঃকরণে আপনার কাজ ভুলিয়াও বামার কাঠ করিয়া দিয়া গেল।

বাহিরের কাজ, যা কিছু, বামাই করে; বা এইরূপে অন্যকে দিয়া করাইয়া লয়। ভিতরের সমস্তই কাজ সুরবালা করেন। রন্ধন প্রত্যহই তাঁহাকে করিতে হয়। এ ছাড়া অন্যান্য গৃহকর্ম্মও তিনি বৃদ্ধাকে বড় করিতে দেন না। সুরবালার সাংসারিক অবস্থাও বড় ভাল নহে। মাতার শ্রাদ্ধের সময়ে আশুতোষ বাড়ীতে নগদ্ টাকা কিছুই রাখিয়া যান নাই। বাঁকুড়ায় যাইয়া অবধি তিনি স্ত্রীকে এক পয়সাও পাঠান নাই। সুরবালা টাকার জন্য স্বামীকে বিরক্ত করিতে চাহিতেন না। আশুতোষ অনেক সময়ে পত্রের জবাবও দিতেন না। মধ্যে মধ্যে সুরবালার মাতা কিছু কিছু পাঠাইতেন। সুরবালা তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ সংসার চালাইতেন। একমাত্র বামা ভিন্ন সুরবালার সাংসারিক অসচ্ছলতা অন্য কেহ জানিতে পারিত না। এমন কি, সরোজিনীও তাহা জানিতেন না। বামা মধ্যে মধ্যে বলিত, "লিখে দাও না—আর এমন করে চলে না।" সুরবালা বুঝাইতেন, তাঁর সেখানে খরচ বেশী, তাই টাকা পাঠাতে পারেন না। মা'র ব্যারামের সময়ে বোধ হয় অনেক টাকা ধার করে এনেছিলেন, তাই শুধ্‌তে হচ্ছে। আমাদের, যা হ'ক, একরকম্ চলে যাচ্ছে।

এইরূপে সুরবালা এক ভাঙ্গা বাড়ীতে একটিমাত্র চাকরাণী লইয়া বাস করেন। বাড়ীটী পুরাতন; অনেক দিন মেরামত হয় নাই। বাহিরের পূজার দালানে অনেক স্থানে গাছ গজাইয়া গিয়াছে। যত দূর হাতে নাগাল পাওয়া যায়, বামা তত দূর পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। ভিতরবাড়ীরও অবস্থা ভাল নহে। কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী রমণী দেবতা। পতিভক্তি এবং আত্ম-ত্যাগে তিনি অতুলনীয়া। সুরবালা অনেক দিন এক বেলা রাঁধিয়া দুই বেলা আহার করেন। কখনও কখনও ব্যঞ্জনহীন অন্নেই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। কিন্তু তাঁহার পিতা মাতাকেও তিনি কখনও এ সংবাদ জানিতে দেন নাই।

শরতের বিবাহের সংবাদ পাইয়াই সুরবালা পিতৃগৃহে যাইবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিয়া স্বামীকে এক চিঠি লিখিলেন। আশুতোষের তাহাতে আপত্তিই ছিল না। বাড়ীর কোনও তত্ত্বই লইতে হইবে না ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে তিনি স্ত্রীর প্রার্থনা-অনুমোদন করিলেন। বামাকে লইয়া সুরবালা বাজিৎপুর চলিলেন।





একাদশ অধ্যায়।



বাজিৎপুরের ঘোষেদের বাটীতে বহুকাল ধরিয়া দুর্গোৎসব হইয়া আসিতেছে। যদুপতির আমল হইতেই পূজার ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। ভবতারণের সময়ে অতি সমারোহের সহিত পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে এ পূজায় আমোদ অপেক্ষা আহারের আয়োজন অধিক। পল্লীগ্রামের হিন্দুর বাড়ীতে পূজা;—ইহাতে সাহেবী ভোজ বা নাচের বন্দোবস্ত নাই। আর ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্যের প্রতি ভার দিয়া গৃহস্বামী বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বিদেশে যান না। ভবতারণের বাটীতে পূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার্ষিক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। বিজয়ার পরদিন সর্ব্বপ্রথমে যে অর্থ হস্তগত হয়, তাহা পরবর্ত্তী পূজার জন্য সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত বৎসর ধরিয়া পূজার আয়োজন চলে। পূজার সময়ে আন্তরিক ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা, এবং

দরিদ্রের সেবা হইয়া থাকে। পূজার তিন দিন ধরিয়া ভবতারণ এবং প্রেমচাঁদ, উভয়ে প্রভাত হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অনাবৃত-চরণে কেবল বাড়ীর এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং আহূত ও অনাহূত সমস্ত ব্যক্তিকেই উপযুক্ত সমাদর দেখাইয়া আহা-রাদিতে পরিতুষ্ট করেন। প্রায় পাঁচ সহস্র লোক আহার, এবং অর্দ্ধ সহস্র লোক্ এক এক খণ্ড নূতন বস্ত্র পাইয়া থাকে।

শরতের বিবাহের পরবর্ত্তী পূজার সপ্তমীর দিনে সকাল বেলায় পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পূজার দালানে এবং প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছেন। ঘোষেদের বাড়ীর নিয়ম এই যে, সপ্তমীর দিনে ব্রাহ্মণ, অষ্টমীর দিনে কায়স্থ, এবং নবমীর দিনে অন্ত্যজাতি ও কাঙ্গালী আদির আহার হইয়া থাকে। বেলা প্রায় দশটা বাজিয়াছে, এমন সময়ে একখানি পাল্‌কী আসিয়া সদর দরজায় নামিল। সম্মুখে এক পার্শ্বে পূজার দালান এবং বাহিরের প্রাঙ্গণ হইতে সদর দরজা দেখা যায়। পাল্‌কী হইতে একটি পুরুষ ও একটিযুবতী নামিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই বাটীর ভিতর হইতে ভবতারণ এবং বাহিরের দিক হইতে প্রেমচাঁদ আসিয়া সদর দরজার সম্মুখে সম্মিলিত হইলেন।

প্রেমচাঁদ কহিলেন, "দাদা, হ'ল কি ?"

ভব। হবে আর কি ? কালের গতি !

প্রেম। বেহারা ব্যাটাদের জিজ্ঞেস কল্লাম—পাঠিয়েছি দু পাল্‌কী ; তোরা এক পাল্‌কীতে আন্‌লি কেন ? তারা বলে,

'আমরা কি কর্‌ব? ছোট বাবু বলেন, 'এক পালকীতে দু'জন যাব। দু পালকীর বেহারা এক পালকীতে আয়; এক পাল্‌কী ষ্টেশনে পড়ে থাক্‌,—এর পর কেউ এলে তাকে নিয়ে যাবি। তোদের আর পালকী বয়ে আন্‌তে হবে না।' এক পালকীতে আস্‌বি, এসে না হয় খিড়কীর দোরে নাব্‌; তা না, আজ একটা ব্যাপারের দিন, বাড়ী পোরা লোক, ও এসে নেবে পড়ল সদর দরজায়। আর বউ ত বিবি। না আছে ঘোম্‌টা, না আছে একটু সঙ্কোচভাব,—অথচ এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী আস্‌ছেন।

ভব। তুমি এখানে ঐ দেখেচ; বাড়ীর ভেতরে আবার ওর উপর। আমার মাথা ঘুরে গেছে। দু জনে হন্‌ হন্‌ করে গিয়ে উপরে উঠ্‌ল। বউমার ইচ্ছাটা যেন শরতের হাত ধরেই বরাবর যান। শরতের সাহসে ততটা বোধ হয় কুলোয় নি। মেয়েরা সকলেই এ দিকে ও দিকে ছিল;—না কাউকে নমস্কার করা, না একটু থামা। উপরে উঠে শুনলাম্‌, একটা চাকরাণী বউমার গায়ের কাপড় খুলে দিয়ে বাতাস কচ্ছে। শরৎ পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরা উপরে যারা গেছিল, দেখে শুনে সব ফিরে এসেছে।

প্রেম। বাহিরের ব্রাহ্মণ যাঁরা দেখেছেন, সব হাঁ করে বসে আছেন।

ভব। হাঁ করে থাক্‌বারই কথা। এ ত আর কখনও দেখেন নি!

প্রেম। এখন এর ওষুধ কি?

ভব। ওষুধু আর কি? তোমার ইচ্ছা হয়, কিছু বুঝিয়ে

সুঝিয়ে দেখ্‌তে পার। ছেলেবেলা থেকেই ত তোমার কথা শোনে। আমি কিছু বল্‌ব না।

প্রেম। আপনার ঐ বুদ্ধিতেই এটা ঘটেছে। আপনি বাধা দিলে কি এত হ'ত ?

ভব। তা না হতে পার্ত্ত। কিন্তু আমি কোন দিনই সে রকম চলি নি। ওর ইচ্ছা হয়,—করুক। আমি আর এক যায়-গায় বে দিলে ওর মনে ভাল বোধ হত না। মুখে কিছু বলুক না বলুক, মনে মনে বল্‌ত —বাবাই আমার এই করিলেন। কাজ কি ভাই? মানুষ করিবার করেছি, লেখা পড়া শেখাবার শিখিয়েছি। এখন ওর বয়স হয়েছে, আক্কেল বুদ্ধি হয়েছে, কাজ কি ওর ইচ্ছেয় বাধা দিয়ে। উনি রোজগার করে এনে দু পয়সা দেবেন, সে প্রত্যাশা করি না। নিজে ভাল হন, সুখে থাক্‌বেন ; না হন, কষ্ট পাবেন ; ও যাই করুক, আমি কখনও ওকে মন্দ দেখিব না। ও কখনও বল্‌তে পারবে না যে, বাবা আমার উপর অন্যায় করেছেন।——যাই, একবার বাইরে দেখিগে।

প্রেমচাঁদ মনের আবেগে কোনও কথা কহিলেন না। ভব-তারণের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, এবং মনে মনে বলিলেন, "দাদা! ধন্য তুমি। তোমার মনে কষ্ট কোন দিনই হ'বে না। শরৎ! এমন বাপ সংসারে ক' জনের আছে ?"

প্রেমচাঁদের অপাঙ্গে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। তিনি বাড়ীর ভিতরে যাইতেছিলেন। দু' এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই একটি তসর-সুতি-পরিধানা অর্দ্ধবয়স্কা অপরিচিতা স্ত্রী-

লোক আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "এদের বাড়ীর চাকর বাকর কথা (১) ?

প্রেমচাঁদের মন ভাল ছিল না। তিনি কহিলেন, "তুমি বুঝি কল্‌কাতা থেকে এসেছ ?"

স্ত্রী। হাঁ বটে।

প্রেম। চাকর কি কর্‌বে ?

স্ত্রী। বাজারক্কে যাবেক সাবান আন্‌তে, দিদিমণি গা ধবেক (২)

প্রেম। তুমি যাও না কেন ?

স্ত্রী। আমি কি আপনার দেশের বাজারকে গেছি। চিন্‌বো ক্যাণে।

প্রেম। জিজ্ঞেস্ করে যাও।

স্ত্রী। আপনি কে বট। কথার জবাব দিবেক নাই।

প্রেম। আ মলো। বল গিয়া তোর দিদিমণিকে এ দেশে সাবান নাই।

স্ত্রী। তুমি কে বট ? তোমার কি তোয়াক্কা রাখি। যাই দিদিমণিকে বলি গিয়ে এখানে থাকা আমার পোষাবেক নাই।

এই কথা বলিয়া স্ত্রীলোকটী গন্ গন্ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। সে রূপবতীর ঝি, তাহার সঙ্গে আসিয়াছে, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য, ঝি প্রেমচাঁদ অপেক্ষা বেশী চটিয়াছে।

(১) কোথা ? (২) ধুইবেক।

ঝি'র স্বপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রেমচাঁদের পরিচ্ছদ দেখিয়া সে তাঁহাকে বাড়ীর 'কর্ত্তাপক্ষীয়' কেহ বলিয়া মনে করে নাই। প্রেমচাঁদের পায়ে চটি জুতা পর্য্যন্ত ছিল না; গায়ে জামা নাই; কেবল পরিধান একখানি ধুতি। আর তাঁহার চেহারাও ঠিক বাবুর মত নহে। ঝি'র অপরাধ বড় বেশী নাই।

পরমপূজ্য স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন কলিকাতার রাস্তায় এক ঝি কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটির ধূলা কিঞ্চিৎ উড়িয়াছিল বলিয়া, এক তসর-পরা তাগা-হাতে ঝি কহিয়াছিল,—"উড়ে বামুনের রকম দেখ।"

হয় ত সে পদধূলি ঝিএর মনিব ভক্তির সহিত মস্তকে লইতেন,—কিন্তু ঝি তাহা জানিবে কি প্রকারে?

তাই বলিতেছিলাম, এস্থলে ঝি'র অপরাধ অধিক নহে।





দ্বাদশ অধ্যায়।



সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা হইয়া গিয়াছে। আজি বিজয়া। শরৎ এবার পূজার ক'দিন প্রায়ই ফাঁকে ফাঁকে কাটাইয়াছেন। পূজার দালানের ধার দিয়াও যান নাই। লোকজনের আহারের সময় কথনও কথনও নীচে আসিয়াছেন মাত্র। বিজয়ার দিন বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। প্রতিমা অনেক্ষণ বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর পুরুষ সকলেই বিসর্জ্জনের নৌকার সঙ্গে গিয়াছেন। শরৎ প্রতি বৎসরই ভাসানের সময় নৌকায় যাইয়া থাকেন। এবারে যান নাই। উপরের একটি ঘরে বসিয়া "স্ত্রীর সহিত কথোপকথন" করিতেছেন। সুরবালা আসিয়া হঠাৎ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছোট্ দা'! ভাসান্ দেখ্‌তে যাবে না?" শরৎ বলিলেন, "না।" সুরবালা চলিয়া গেলেন।

শরৎ রূপবতীতে কথাবার্ত্তা যেরূপ চলিতেছিল, আমরা নিম্নে তাহার একটু নমুনা দিলাম।

রূপবতী কহিলেন, "আমি কিছুতেই থাক্‌ব না। তোমার সঙ্গেই যাব।"

শ। আমারই কি ইচ্ছা তোমাকে রেখে যাই? কিন্তু মাঘ মাস পর্য্যন্ত তোমার এখানে থাক্‌বার কথা।

রূ। এ দেশে মাঘমাস পর্য্যন্ত থাকতে গেলে আমি মারাই যাব। আর আমি কি একলা থাক্‌ব? ঝি কিছুতেই থাক্‌বে না।

শ। ঝিএর রাগ পড়ে নি? বলিছি ত, কলিকাতায় গিয়েই ওকে একখানা ভাল গরদ কিনে দেব।

রূ। তা' ত দেবে? যে অপমানটা হয়েছে ওর তোমার বাড়ীতে এসে।

শ। আমার বাড়ী, তোমার বাড়ী নয়?

রূ। আমার বাড়ী হবে,—যদি কখনও কলিকাতায় বাড়ী কর, তা হলে। বাপ্‌, এই দেশে আবার বাড়ী—এত বড় একটা বাড়ী করেছে, এর ওপরে একটা পায়খানা নাই!

শ। সেকেলে বাড়ী আমাদের—

রূ। সব সেকেলে, শুধু বাড়ী কেন? হাজার কল্‌কাতায় যাও, আর যেখানে যাও, পাড়াগেঁয়ে ভাব তোমাদের যাবে না।

শ। আমি কল্‌কেতাতেই বাড়ী কর্‌ব।

রূ। না কর্‌লে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নাই। বাবা, এ দেশেও মানুষ থাকে। সব অসভ্যের একশেষ।

আমাকে দেখ্‌লেই হাসে—ছোট ছোট মেয়েগুলো পর্য্যন্ত। আমি যেন ঠিক আলিপুরের বাগানের এক জানোয়ার!

শ। আমি তোমাকে নিয়েই যাব?

রু। না নিয়ে গেলে র'ক্ষে থাক্‌বে না। ঝি সেই দিনই চ'লে যেত। আমি কত বুঝিয়ে সুজিয়ে রেখেছি। গুম্‌রে গুম্‌রে ম'চ্ছে। কত আহ্লাদের ঝি ও জান? ও আমার মাকে বাপান্ত করে!

শ। দূর! অমন কথা বলতে নাই!

রু। বল্‌তে নেই কি? আদুরে ঝি ঐ ক'রে থাকে! তোমরা ত কখনও ঝিএর মুখ দেখনি। আছে কেবল কতকগুলো ছোটলোক চাকরাণী,—চাঁড়াল, বাগ্দী,—এই সব!

শ। তা যা'ক্ গিয়ে। কি ব'লে তোমায় নিয়ে যাওয়া যায়?

রু। কেন, বল না যে মা'র অসুখ করেছে—চিটি পেয়েছ—

শ। মিথ্যে কথাটা বল্‌ব?

রু। কি সত্যপীর রে!

শ। দেখা যা'ক্! বোধ হয় অমনই হবে।

বস্তুতঃ নববধূর আচরণে বাড়ীর সকলেই এমন বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, শরৎ তাহাকে রাখিয়া গেলেই তাঁহারা বিপদ মনে করিতেন। সুতরাং, শরতের মিথ্যা কথা কহিবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি স্ত্রীকে লইয়া যাইবেন, এ কথা জিহ্বাগ্রে আনিলেই সকলে অনুমোদন করিতেন। কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল।

শরৎ এবং রূপবতীর কথোপকথনেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রতিমাবিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। সকলেই বাড়ী ফিরিয়াছে। নমস্কার এবং কোলাকুলির ব্যাপার চলিতেছে। ভবতারণ এবং প্রেমচাঁদ গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই নমস্কার পাইতেছেন, এবং ভৃত্যদিগকেও কোল দিতেছেন। প্রেমচাঁদের মাতা পূজার দালানের নিকটে ধান্য-দূর্ব্বা লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সকলে যাইয়া নমস্কার করিতেছে। বৃদ্ধা তাহাদের মস্তকে ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ভবতারণের স্ত্রীও অনেকের পূজনীয়া। তিনি বাটীর মধ্যেই আছেন, পাড়ার অসংখ্য ছেলে আসিয়া তাঁহাকে কেহ জ্যেঠাইমা, কেহ কাকীমা, কেহ ঠাকুরমা. বলিয়া নমস্কার করিয়া যাইতেছে। শরৎ কিন্তু নীচে আসেন নাই।

সুরবালা উপরে যাইয়া কহিলেন,—"ছোড়দা, তুমি কাউকে নমস্কার ক'র্‌বে না ?" শরৎ উত্তর করিলেন, "না, আজ না !"

সুর। সে কি ?

শর। তুই যা না!

সুরবালা আসিয়া তাহার ছোট ঠাকুরমার কাছে কহিল যে, শরৎ উপরে রহিয়াছেন, নীচে আসিবেন না !

বৃদ্ধা ছুটিয়া উপরে গেলেন, এবং শরৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ওরে, আমাদের পায়ে গড় ক'ল্লে তোর বিবিরই অপমান হবে! তোর ত না হ'তে পারে ? এই সন্ধ্যার পর তুই কি ব'লে ওপরে ব'সে আছিস্ ? আজকের দিনে বাড়ী পোরা

লোক,—তুই ওপরে! আর আর বছর ত পাড়ার সব বুড়ো বুড়ীদের নমস্কার ক'রে আস্‌ছিস্! বাড়ীর লোকে অপরাধ ক'রে থাকে, না হয় তাদেরই নমস্কার করে আয়!"

শর। আমি আজ বেরুব'না।

প্রেমচাঁদের মাতা। কি দুর্লক্ষণের কথা! আজ বৎসরের একটা দিন, তুই না হয় নীচে গিয়ে ব'সে থাক্!

শর। যাও না তুমি, আমি যাব না!

ভবতারণ বাহিরে বসিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে বাড়ীর এবং পাড়ার সকলেই নমস্কার করিয়া গিয়াছে, কিন্তু শরৎ আসেন নাই! শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরৎ কোথায়?

শ্যামাচরণ ছুটিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন; এবং সুরবালার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উপরে উঠিলেন।

সুরবালা সঙ্গে চলিলেন, এবং শরৎকে ডাকিয়া কহিলেন, "বড়দা উপরে যাইতেছেন।"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "শরৎ! বাবাকে নমস্কার কর নি?"

শর। না।

শ্যামা। কেন?

শর। দরকার হয়, কাল করব। আজ না!

শ্যামা। সে কি? আজ সকলেই নমস্কার ক'চ্ছে। যাও, নীচে যাও, বাবা জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন!

শর। এ কি একটা কথা যে, আজ না ক'ল্লেই হবে না! মা বাপকে নমস্কার করা যে দিন ইচ্ছা ক'ল্লেই হল!

এই সময়ে নীচে হইতে শরতের মা আসিলেন, এবং শরতের শেষ কথাটি শুনিয়া কহিলেন, "তোমার নমস্কার করবার দরকার নাই। একটু এগিয়ে এস, আমি দুটো ধান-দূর্ব্বা মাথায় দিয়ে যাই!"

শর। না, ধান-দূর্ব্বা মাথায় দিতে হবে না। অমনই আশীর্ব্বাদ কর!

মাতা। আজকার দিনে সকলেই মাকে নমস্কার করে!

শর। তা করুক, আমি করব না!

শরতের মাতা একটু অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"আমি এই ধান-দূর্ব্বাটা মাথায় দিয়ে যাই!"

শর। ও মাথায় দিলে, আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব!

শরৎ মনে মনে কহিলেন, পৌত্তলিক প্রথার প্রশ্রয় দিব না!

শরতের জননী সেই ধানদূর্ব্বাগুলি হস্তে লইয়া কহিলেন. "কি আর বল্‌ব? তোমার যেমন বুদ্ধি হ'য়েছে, তাই কর! মা দুর্গা জানিবেন—এতে যেন তোমার কোনও অমঙ্গল না হয়। আজকার দিনে সকলেই মা বাপের আশীর্ব্বাদ নেয়!"

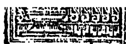
শরৎ অচল অটল,—মনে মনে কহিতেছেন, পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিব না! ইহার পর দিনই শরৎ সস্ত্রীক কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বাটীর কেহ কোনও আপত্তিই করিল না।





ত্রয়োদশ অধ্যায়।





বামা বলিল, "এ এক রকম পায়ে পড়ে যাওয়া"! পূজার পর সুরবালা শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাঁকুড়ায় যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া, আশুতোষকে দুই তিন পত্র লেখা হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহার উত্তরই দেন নাই। বাসা প্রস্তুত হইয়াছে কি না, সংবাদ জানিবার জন্য পত্রে জিজ্ঞাসা ছিল; আশুতোষ তদ্বিষয়েও কোনও কথা কহেন নাই। ফলতঃ নূতন বাসা নির্ম্মাণ করিবার কথা ছলনামাত্র। আশুতোষ পূর্ব্ব হইতে যে বাসায় থাকেন, তাহাতেই পরিবার লইয়া থাকিবার বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু তিনি এ কথা বাড়ীতে জানিতে দেন নাই। বামা কোনওরূপে জানিতে পারিয়া সুরবালাকে ইহা কহিয়াছে। সুরবালা বাঁকুড়ায়

যাইবার জন্য অধীর হইয়াছেন। এ ভাবে যাওয়ায় বামার সম্মতি ছিল না, তাই সে সুরবালার কথা শুনিয়া বলিল, "এ এক রকম গায়ে প'ড়ে যাওয়া!"

সুরবালা কহিলেন, "পরের কাছে যেতে গেলে ও কথা খাটে। আমি ত আর পরের বাড়ী যাচ্ছি না!

বা। আদর না থাক্‌লে, আপনার বাড়ী পরের বাড়ীর চাইতেও খারাপ!

সু। ঝি, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না! এখানে দুধে ভাতে খাবার চাইতে সেখানে যেয়ে যদি আমি না খেয়ে থাকি, সেও ভাল! তুমি ত ব'লছ সেখানে ঘর আছে; যদি ঘর না থাকৃত, তা হলেও আমি যেতাম। সেখানে যেয়ে, তাঁর কাছে গাছের তলায় থাকি, সেও ভাল!

বা। তাঁর কাছ পেলে ত হতই, তিনি যে তাঁতে নাই।

সু। তা ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু তিনি ভাল হ'লেও আমার, মন্দ হ'লেও আমার। তাঁর ভাল মন্দে আমার যত আস্‌বে যাবে, পৃথিবীতে এত কারও নয়। আবার যদিই তাঁর কোনরূপ মতিভ্রম হ'য়ে থাকে, তা শোধ্‌রাতে আমি যেমন পারব, সংসারে এমন কেউ পার্‌বে না!

বামা এতক্ষণ তর্ক করিতেছিল, এই বার তাহার মন গলিল। সে কহিল, "ধন্য মেয়ে তুমি!—ভগবান তোমার মনের দুঃখ দূর করিবেন! চল, আমি তোমাকে বাঁকুড়ায় নিয়ে যাই।" সুরবালাও এতক্ষণ বামাকে বুঝাইতেছিলেন। এইবার তাহার

সহানুভূতি পাইবামাত্র চ'ক্ষে জল বাহির হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"সেখানে যাই—লোকে জান্‌বে আমি আমার স্বামীর কাছে আছি—তাঁরও নিন্দা হবে না—আমারও মনের কষ্টের লাঘব হবে।"

বস্তুতঃ স্ত্রীর কোনও সংবাদ না লওয়ায়, লোকে আশুতোষকে অতিশয় নিন্দা করিত। সুরবালার ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমার জন্য স্বামী নিন্দার ভাজন হইতেছেন, ইহাই ভাবিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেন। এরূপ চিন্তাও তাঁহার মনে আসিত যে, বাঁকুড়ায় গেলে স্বামী যদি আমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করেন, তাহা আমি লোককে জানিতে দিব না। আমার আপনার লোক ত কেহ জানিতেই পারিবে না। সেখানকার কেহ জানিলেও তত আসে যায় না। তাহারা ত অপরিচিত। সুরবালার এইরূপ চিন্তা অস্বাভাবিক নহে।

সংসারে সাধারণতঃ ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতীকারের আশা না থাকিলে, মানুষ ইচ্ছা করিয়া আপনার দুঃখ বা অবমাননার বিষয় অন্যকে জানিতে দিতে চাহে না। অনেক সময়ে অন্যে জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই মানুষের মনে কষ্ট অধিক অনুভূত হইয়া থাকে। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই মনে এই ভাব সমান দেখা যায়। একরূপ লজ্জা যেন প্রত্যেক মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। আমি অন্যের উপহাসের বা সহানুভূতির পাত্র হইব ইহা যেন কেহই ইচ্ছা করে না।

শিশু আপন মনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে নিজের দোষে আঘাত পাইল; নিকটে কেহ না থাকিলে, হয় ত গ্রাহ্যই করিল না। গা ঝাড়িয়া পুনরায় দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যেমন সে আঘাত পাইয়াছে, অমনি জননী আসিয়া দেখিলেন, কহিলেন, আহা বড় লেগেছে!—বালক তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাঁদিয়া উঠিল। যুবক অসাবধানতায় অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। উঠিয়াই চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অন্য কেহ দেখিল কি না? যদি কেহ না দেখিয়া থাকে,—ধূলা ঝাড়িয়া অমনি অশ্বে উঠিলেন; কিন্তু নিকটে কাহাকে দেখিতে পাইলেই লজ্জা ও কষ্টের একশেষ হইল। অথবা বঙ্গের কোনও দরিদ্র বৃদ্ধ প্রজা অত্যাচারী ভূস্বামী কর্ত্তৃক অল্প কারণে বা অকারণে নির্দ্দয়রূপে প্রহারিত হইল। প্রহারান্তে সে পাদুকা-স্পৃষ্ট পৃষ্টদেশে বা রুধিরাক্ত অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার পূর্ব্বেই চাহিয়া দেখিল, দর্শকমণ্ডলীমধ্যে তাহার পরিচিত লোক কেহ আছেন কি না। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রত্যেক স্থলেই অপরিচিত অপেক্ষা পরিচিত লোকের উপস্থিতি সমধিক অসহনীয় হইয়া থাকে।

স্বামীর অবজ্ঞা যে স্ত্রীলোকের মর্ম্মান্তিক ক্লেশের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু অন্যের নিকট জ্ঞাপন করিলে, ইহার প্রতীকারের আশা নাই। সুতরাং, সুরবালা যে ইহা যত দূর সাধ্য গোপন করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? ফলতঃ তিনি সঙ্কল্প করিলেন, সেখানে যাইয়া স্বামীর স্বভাব

সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। যদি জগদীশ্বর আমার সহায় হন, তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হয়, তবেই দেশে ফিরিব; নচেৎ আর আপনার জন কাহারও কাছে মুখ দেখাইব না।

সুরবালা! তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। যদি মানুষের চরিত্র পরিবর্ত্তনে মানুষের কোনও শক্তি থাকে, তবে তাহা তোমার ন্যায় সাধ্বী রমণীরই আছে।

বামার মত হওয়াতে সুরবালা আনন্দিতা হইলেন। এক্ষণে যাইবার কথা। বামা আর সুরবালা বাঁকুড়ায় যাইতে পারেন না। কিন্তু উদ্দেশ্যসাধনে দৃঢ়কাম হইলে, উপায়ের জন্য ভাবিতে হয় না। কালিদাস কহিয়াছেন যে, স্থিরনিশ্চয় মন আর সমুদ্রগা স্রোতস্বতী, ইহাদিগকে কেহই বাধা দিতে পারে না। সুরবালা স্বামিসদনে যাইতে কৃতসঙ্কল্পা। ইহাতে প্রতিবন্ধকতা ঘটিবে কেন? এই সময়ে সরোজিনীর ভ্রাতা কয়েক দিনের জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সুরবালা প্রস্তাব করিলেন, তিনি বাড়ীতে থাকিবেন, আর কয়েক দিনের জন্য বিদায় লইয়া বিপিন তাহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন। বিপিনবিহারী সহজেই ইহাতে সম্মত হইলেন। সুরবালার যাইবার দিন স্থির হইয়া গেল।





চতুর্দ্দশ অধ্যায়।



বাঙ্গালা ১২/—সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রিতে যে ডাকগাড়ী রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়ায় যায়, তাহাতে আরোহী ছিলেন বিপিন, বামা ও সুরবালা। ১৮ই অগ্রহায়ণ প্রাতে তাঁহারা বাঁকুড়ায় পঁহুছিলেন। আশুতোষের বাসা খুঁজিয়া লইতে কোনই কষ্ট হইল না। গাড়োয়ানকে তাঁহার নাম বলিবামাত্র সে চিনিতে পারিল, এবং ডাক নামাইয়া দিয়াই একেবারে গাড়ী লইয়া আশুতোষের বাসার সম্মুখে দাঁড় করাইল। অসৎকার্য্যে অপরিমিত ব্যয় করেন বলিয়া, আশুতোষের নাম বাঁকুড়ায় সুপরিচিত। সুরবালা ও বামা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আশুতোষ তখন নিদ্রাগত। ক্ষণকাল পরেই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিপিন এবং বামা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সুরবালার আগমন-

বার্ত্তা জানাইলেন। আশুতোষ এক বিরক্তিব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিলেন, কিন্তু কোনও কথা কহিলেন না। প্রাতর্ভোজন শেষ হইলে বিপিন কহিলেন, "আমি আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাইতে চাই!" আশুতোষ তাহাতে সম্মতি না দিয়া তাহাকে একদিন থাকিতে কহিলেন, এবং আপিসে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যাকালে আশুতোষ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বিপিন তখন বেড়াইতে গিয়াছেন। আশুতোষের ভৃত্য এবং পাচক উভয়েই বাজারে বাহির হইয়া গিয়াছে। বাসায় সুরবালা এবং বামা।

আশুতোষ গৃহমধ্যে বসিয়া কাপড় ছাড়িতেছেন, এমন সময়ে অবসর বুঝিয়া সুরবালা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে তাঁহার গাত্র, দৃষ্টি এবং মুখশ্রীতে, এমন কি, সর্ব্বাবয়বে যে এক অপূর্ব্ব মনোহর ভাব লক্ষিত হইতেছিল; আমরা তাহার সম্যক্ বর্ণনা করিতে অক্ষম! স্বামিসন্দর্শনে সাধ্বী স্বভাবতই পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন। অনাদর আশঙ্কায় সুরবালার অঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কণ্টকিত হইতেছিল, কিন্তু সর্ব্বোপরি নম্রতা এবং দীনতার ছায়া তাঁহার সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করিয়াছিল। তিনি আশুতোষের সম্মুখে আসিয়া এমনই ভাবে দাঁড়াইলেন, যেন কোনও আজ্ঞাকারিণী পরিচারিকা আদেশপ্রতীক্ষায় প্রভুসমীপে দণ্ডায়মান। আশুতোষ একবারমাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইলেন; কোনও কথা কহিলেন না। সুরবালা আস্তে আস্তে স্বামীর পায়ের জুতা মোজা খুলিয়া

লইলেন। এবং পতিপদে হস্তস্পর্শ করিয়া সেই হস্ত মস্তকে দিলেন ; এই অবসরে নয়নের দুই এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু অলক্ষিতে আশুতোষের চরণদ্বয় ধৌত করিল। আশুতোষ কথা কহিলেন—

মানুষের হৃদয় পাষাণ নহে। আশুতোষ মনে করিয়াছিলেন, স্ত্রীকে অতি কর্কশভাবে সম্বোধন করিবেন। কিন্তু স্বরবালার ব্যবহার দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। পূর্ব্বকল্পিত কঠোরতা অনেকটা পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি কহিলেন—

"তুমি একেবারে এখানে এসে উঠ্‌লে কার কথামত ?"

স্থ। কথা আর কার ? তোমার কাছে আস্‌ব, এতে আর কার কথার দরকায় ?

আ। স্ত্রীস্বাধীনতার স্কুলে প'ড়েছ বুঝি ?

সু। স্বামীর কাছে আস্‌তে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা সকল সময়েই সমান।

আ। এখানে যদি ঘর না থাক্‌ত ?

সু। তুমি যেখানে থাক্‌তে, আমিও সেখানে থাক্‌তাম্।

আ। গাছের তলায় ?

সু। হাঁ, গাছের তলায়।

আ। বাবা! তোমার মতন স্ত্রীলোক ত্রেতাযুগে জন্মালে ছিল ভাল!

স্থরবালা এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া ম্লান মুখ আরও নত করিলেন।

তাঁহার যে অবস্থা, তাহাতে বিদ্রূপ ভাল লাগিবে কেন ?

আশুতোষ ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া কহিলেন,—"এখন যেমন এসেছ—তেম্‌নি অনুগ্রহ করে, কালই আবার বিপিনের সঙ্গে ফিরে যাও দেখি!"

সু। তা হ'লে কি তুমি সুখী হও?

আ। আমার জন্যে বল্‌ছি না, তোমারই জন্যে বল্‌ছি! কেন এখানে থেকে, মিছামিছি কষ্ট পাবে? আমি পাঁচ দিন থাকি বাসায়, আর দশ দিন থাকি বাইরে।

সু। তা হো'ক, তবু ত পাঁচ দিনেরও জন্যে তোমাকে দেখ্‌তে পাব?

আ। বড় বেশী খাতির যে! যাদু টাদু জান কি?

সু। তুমি ব'ল্লে কাজেই আমাকে ফিরে যেতে হবে! কিন্তু আমি দেশে থাকায়, লোকে তোমারই নিন্দা করে! এখানে এসে ফিরে গেলে, তোমার আরও অখ্যাতি হবে! আমি এই-খানেই থাকি। যদি কখনও তোমার কোনও অসন্তোষের কাজ করি, আমাকে সেই দিনই তাড়িয়ে দিও।

সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আশুতোষের মন অনেকটা নরম হইল। বিবাহিতা স্ত্রী নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর ন্যায় আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, এরূপ চিন্তা তাঁহার মনে আসিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন, যেরূপ দেখিতেছি এবং জানি, এ যে সহজে আমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিবে, এমন বোধ হয় না। পয়সা কড়িও যে, ও থাকিলেই অধিক ব্যয় হইবে, তাহাও নহে! বড়-

মানুষের মেয়ে—বরং ওর দ্বারা আমার কিছু সাহায্য হইতে পারে। আর লোকের কাছে বলা যাবে, আমি এখন পরিবার নিয়ে আছি। এ একটা আবরণ মন্দ নয়। যাদের সঙ্গে ইয়ার্কি দি, তাদেরও ত সকলেরই পরিবার সঙ্গে।

ক্ষণেক পরে আশুতোষ কহিলেন, "আচ্ছা, এসেছ থাক। বিপিন তা হ'লে বাড়ী যাক্। তোমাদের নে যাবে ব'লেই আমি ওকে থাক্‌তে বলেছিলাম।"

সুরবালা ইহাতেই যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। ইহাকেই তিনি স্বামীর আদর মনে করিয়া লইলেন। বাড়ী হইতে আসিবার সময় এরূপ ব্যবহার পাইবেন, ইহা তিনি আশা করেন নাই। সংসারে মানুষ অনেক সময়ে অধিক আশা করিয়াই ঈপ্সিত বস্তুলাভেও সুখ অনুভব করিতে পারে না।

আশুতোষ কহিলেন, "আমাকে জল খেয়েই বেরুতে হবে!"

সু। কোথায় যাবে?

আ। নিজের কাজে এ পর্য্যন্ত কখনও কোনও কৈফিয়ৎ দিই নি। সরকারী কাজে মাঝে মাঝে উপরিস্থের কাছে দিতে হয় জানি।

সু। আমি ত আর কৈফিয়ৎ চাই নি। অম্‌নি জিজ্ঞেস কচ্ছিলেম।

আ। নেমন্তন্ন আছে!

সু। কখন ফির্‌বে?

আ। রাত্রে ফিরি কি না, বল্‌তে পারি না।

সুরবালা আর কথা কহিলেন না।

আশুতোষ বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই মনে করিলেন, স্ত্রীর প্রতি এক দিনেই অনেকটা অনুগ্রহ দেখাইয়া ফেলিয়াছেন। পরে ভাবিলেন, একবারে থাকার অনুমতিটা দিয়ে অতি গর্হিত কাজই করা হইয়াছে। শেষে সিদ্ধান্ত হইল, ইয়ারবর্গের সহিত একবার এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব।

পর দিন প্রভাতেও আশুতোষ বাসায় ফিরিলেন না। বেলা ৮টা বাজিলে, তাঁহার চাকর রামা যাইয়া তাঁহাকে কোনও ভদ্র-লোকের অগম্য স্থান হইতে তুলিয়া আনিল। আশুতোষ স্নান করিয়াই নিদ্রাভিভূত হইলেন, এবং সারা দিন ঘুমাইয়া কাটাই-লেন। সে দিন রবিবার ছিল। সন্ধ্যাকালে বিপিনের যাইবার সময় আশুতোষ উঠিলেন, তখনও তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ।

বিপিন চলিয়া গেল। সুরবালা রহিয়া গেলেন; মানুষ না পিশাচের নিকটে ?





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।



শরৎ সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। নববধূর আচরণে বাজিৎপুরের অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা বিশেষ সন্তুষ্ট হন নাই; সুতরাং, তাহাকে রাখিবার নিমিত্ত কেহই তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। শরতের ব্যবহারে এবার বাড়ীর লোক সকলেই দুঃখিত। বিশেষ চটিয়াছিলেন শরতের জননী, এবং তাহার পিতৃব্য প্রেমচাঁদ। যে শরৎ মাছ না খাইয়া একদিন মাকে কাঁদাইয়াছিলেন, এবার তিনি পূজার সময়ে অম্লানবদনে মৎস্যমাংসে উদরপূর্ত্তি করিয়াছেন। কেমন করিয়া প্রকাশ পাইল জানি না, কিন্তু বাড়ীর কাহারও জানিতে বাকি নাই যে, শরৎ শাশুড়ীর কথায় পুনরায় মাছ খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শরতের মাতা ও প্রেমচাঁদের প্রতিজ্ঞা এই যে, শরৎ যদি দেশে আসিয়া আর এক বিবাহ করে, তবেই তাঁহা-

দের দুঃখ যাইবে। নচেৎ তাঁহারা আর তাহার মুখদর্শন করিতে ইচ্ছুক নহেন। ভবতারণ এবং শ্যামাচরণ এ মতের পোষকতা করিলেন না। ভবতারণের ন্যায় লোক আমরা সংসারে কম দেখিতে পাই। তাঁহার চিত্ত উদারতা-পরিপূর্ণ। তিনি ক্রোধ ক্ষোভ প্রভৃতি সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন। পুত্রের ব্যবহারে মনে কিঞ্চিৎ ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকিলেও সে সাময়িক। গৃহিণী এবং প্রেমচাঁদের কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "অমন কথা ব'লো না। যিনি তা'র হাতে প'ড়েছেন, তিনিই সুখে থাকুন। আমরা আর ক'দিন থাক্‌ব? আমাদের প্রতি ওদের যেমন ইচ্ছা তেমনই ব্যবহার করুক!"

শ্যামাচরণ দুই কারণে পিতার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ভ্রাতৃস্নেহ তাঁহার অসীম ছিল। শরতের বিজাতীয় ব্যবহারেও তিনি তাহার প্রতি বীতস্নেহ হন নাই, আর তাঁহার মতে এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে পুনরায় দারপরিগ্রহ করা নিতান্ত অসঙ্গত।

প্রেমচাঁদের মাতা সুস্থ থাকিলে হয় ত এ আন্দোলনে একটা মত দিতেন। কিন্তু পূজার পূর্ব্ব হইতেই তিনি পীড়িত এবং শয্যাগত ছিলেন। শীতের আগমনে তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাঘ মাসের শেষে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লওয়া হইল। ফাল্গুনের প্রথমেই বৃদ্ধা জাহ্নবীতটে তনুত্যাগ করিলেন।

মহাসমারোহে শ্রাদ্ধের আয়োজন হইল। ভবতারণ কহিলেন, "দেশে এই আমার শেষ কাজ—যথাসাধ্য ব্যয় করিব।" প্রেমচাঁদের ত জননী!

কথা উঠিল, শরতের স্ত্রীকে আনিতে কলিকাতায় লোক যাইবে কি না। ভবতারণের সম্মতিও নাই, অসম্মতিও নাই। প্রেমচাঁদও কোন কথা কহিলেন না। শ্যামাচরণের আদেশমত তাঁহার পুত্র সুশীল কলিকাতায় গেল। শরতের সে সাক্ষাৎ পাইল না। তিনি যে বাসায় থাকিতেন, সেখানে যাইয়া শুনিল, শরৎ এখন শ্বশুরবাড়ীতেই থাকেন। সুশীল শরতের শ্বশুর-বাড়ীতে গেল। সেখানে জানিল, শরৎ কয়েক দিনের জন্য কোনও বন্ধুর সহিত হুগলিতে বেড়াইতে গিয়াছেন।

শরতের শাশুড়ী সুশীলকে কিরূপ আদর করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বালক ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, এবং তাহার মনে হইয়াছিল যে, তাহাদের বাড়ীতে অপরিচিত অতিথিও ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক সমাদর পাইয়া থাকে! সুশীল দুই দিন বাহিরেই পড়িয়াছিল। রূপবতী এবং তাহার জননী দুই একবার মাত্র তাহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন। বালক কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া এ কথা কাহাকেও বলে নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কখনও কাকীমার বাপের বাড়ীতে যাইব না।

শরতের শাশুড়ী তাহাকে বলিয়া দিলেন, জামাই বাবু বাড়ী ফিরিলে এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। সুশীল একবারমাত্র বলিয়াছিল, "কাকীমা আমার সঙ্গে চলুন; কাকাবাবু শেষে যাবেন!" প্রিয়নাথপত্নী ইহাতে এমন এক অপ্রীতিকর উত্তর দিয়াছিলেন যে, বালক তাহা শুনিয়া সেই দিনই বাড়ী ফিরিয়া যায়।

ইহার পর শ্রাদ্ধের দিন শরৎ একাকী বাড়ী গিয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যুষেই "আমার কাজ আছে, কলিকাতায় যাইতে হইবে" বলিয়া, ঠিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ন্যায় গৃহত্যাগ করেন। কাঙ্গালীবিদায়, দরিদ্র-ভোজন প্রভৃতি কাজ শরৎ চিরদিন উৎসাহের সহিত করিতেন, এবার কিছুতেই যোগ দেন নাই। বাড়ীর অনেক লোক তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবার অবসর পান নাই।

ভবতারণ ইহার পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসে পৌত্র সুশীলের বিবাহ দেন। শরৎ কিংবা তাহার স্ত্রী কেহই সে বিবাহে আসেন নাই। শরতের শাশুড়ী পীড়িত, এই কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মাঘ মাসে ভবতারণ এবং প্রেমচাঁদ সস্ত্রীক পশ্চিমে যাইবেন, স্থির হইয়া গেল। ভবতারণ এবং তাঁহার গৃহিণী আর ফিরিবেন না, ইহা নিশ্চয়। প্রেমচাঁদেরও আসিবার তেমন ইচ্ছা ছিল না। তিনি গোপনে এক দানপত্র লিখিয়া রেজেষ্টারি করিয়া রাখিয়া গেলেন। তাহাতে তাঁহার যাহা কিছু, তাহা তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সুশীল পাইবে এইরূপ লিখিত হইল।

একদিন ইহার মনে ছিল, শরৎকে সমস্ত দিবেন। শরৎ বলিতে পারেন, ধনসম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন কি? আমি রূপবতীকে পাইয়াছি। ফলতঃ, শরৎ বাড়ীর সহিত সম্বন্ধ ক্রমশই ভুলিয়া যাইতেছিলেন। এখন তিনি বাড়ীতে পত্রাদিও কম লিখিয়া থাকেন। বাড়ীতে আসা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রূপবতীর রূপের মোহে তিনি মুগ্ধ। তাহাকে ছাড়িয়া একদিনের জন্য কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না। রূপবতী আবার দেশে যাইতে একবারেই অনিচ্ছুক।

এমন অবস্থাতেও ভবতারণ কহিলেন, পশ্চিম যাইবার সময়ে কলিকাতায় একবার শরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। হয় ত ইহাই শেষ সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া, গৃহিণী বিশেষ আপত্তি করিলেন না। তিনি কহিলেন, আমরা কালী-ঘাটে গিয়ে একটা লোক পাঠিয়ে দেব, তার ইচ্ছা হয় যাবে, না হয় না যাবে। ভবতারণ কহিলেন, না হয় তার শ্বশুরবাড়ী হয়েই তাকে দেখে গেলুম, সেখানে ত আর থাক্‌তে যাচ্ছি না। এতে আর মান অপমান কি ? গৃহিণী কহিলেন, আমি তা যাব না ; যদি সে পুত্র হ'ত যেতুম।

ভবতারণ এবং গৃহিণী যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে-ছিলেন, তখন প্রেমচাঁদ তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে-ছিলেন ; শৈশব হইতেই শরতের প্রতি তাঁহার স্নেহ অসীম ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শরতকে তিনি পুত্রবৎ বাৎসল্য করিতেন। শরতের আধুনিক ব্যবহারে প্রেমচাঁদের সংসারের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা হইয়াছে। শরতের ব্যবহার ভাল হইলে, তিনি এত শীঘ্র সংসারত্যাগের সঙ্কল্প করিতেন না।

ভবতারণ দেখিবামাত্র কহিলেন, ছিঃ, কাঁদ কেন ভাই ? আপনার পথ আপনি ভাব—সংসারে কে কার ?

ধন্য ভবতারণ, সংসারে সমস্ত লোকই যদি তোমার মত

হইতে পারিত, তাহা হইলে শোকে ক্ষোভে কাহাকেও অধীর হইতে হইত না।

পাঠক, ভবতারণ এবং তাঁহার গৃহিণীর সহিত আর হয় ত দুই একবার মাত্র আপনার সাক্ষাৎ হইবে। একবার ভাল করিয়া দেখিয়া রাখুন। ভবতারণের ন্যায় উচ্চপ্রকৃতির লোক সমাজে বোধ হয় অধিক নাই। তাঁহার স্বভাব উদারতা-ভরা। গৃহিণীর অন্তঃকরণে যেমন দয়া, তেমনই দৃঢ়তা। তিনি এখন শরৎকে পুত্র বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না। গৃহিণী নিজে কর্ত্তব্য-পরায়ণা, তাই অন্যের নিকট কর্ত্তব্যপালন আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং ত্রুটি দেখিলে সহ্য করিতে পারেন না। ভবতারণ নিজে অতি পবিত্রপ্রকৃতি হইলেও, উদাসীনের ন্যায়, অন্যের দুর্ব্ব্যবহার উপেক্ষা করিতে পারেন।





ষোড়শ পরিচ্ছেদ।



এ দিকে শরচ্চন্দ্রের শ্বশুর-বাড়ীতেও পরিবর্ত্তন কম হয় নাই। প্রিয়নাথ বাবু পৌষমাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। যে আপিসে তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাহার বড় সাহেব তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। প্রিয়নাথ বাবু শয্যাগত হইলে, সাহেব সংবাদ পাইয়া দুই দিন তাঁহাকে দেখিতে আসেন। আপিসের বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা সকলেই প্রিয়নাথের মৃত্যুতে বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

প্রিয়নাথের বাড়ীতে এখন শরৎ ত থাকেনই। প্রিয়নাথের শ্যালকও সেখানে আসিয়াছেন। রূপবতীর মাতুলের সহিত পাঠকের এ পর্য্যন্ত পরিচয় হয় নাই। কিন্তু মামাকে আর উপেক্ষা করা চলে না। এই স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বিবৃত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

মামা তাঁহার পিতার শেষ সন্তান এবং একমাত্র বংশধর। মামার পিতা মাতা উভয়েরই কাল হইয়াছে। এখন আছেন কেবল তাহার দুই সহোদরা। জ্যেষ্ঠা প্রিয়নাথ-পত্নী। কনিষ্ঠা বাবু পদ্মলোচন দাস আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের স্ত্রী। মামার জন্মের পূর্ব্বে প্রিয়নাথের শাশুড়ী আরও তিনটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, তাহারা শৈশবেই মরিয়াছে। মামাকে ধাত্রীর নিকট হইতে তিন কড়া কড়ি দিয়া কিনিয়া রাখা হয় বলিয়া তাহার নাম তিনকড়ি রাখা হইয়াছিল। মামা কিন্তু এখন সে নাম বদলাইয়া পোষাকী নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথবা করিতে চাহেন।

মামার পিতার বেশ পয়সা ছিল। পয়সা ছিল বলিয়াই তিনি প্রিয়নাথ এবং পদ্মলোচনের ন্যায় জামাতা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বংশ সম্বন্ধে অনেক লোকে অনেক কথা বলিত। আমরা প্রভূত গবেষণা সহকারে অনুসন্ধান করিয়াও মামার পিতামহের নাম জানিতে পারি নাই। আজ কাল পূর্ব্বপুরুষের নাম ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টাও অসভ্যতার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে সফলকাম না হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। মামাকে তাহারা 'কোথাকার বসু', 'কাহার সন্তান' ইত্যাদি প্রশ্ন করিলে, তিনি মারিতে উঠিতেন। যে পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, মামার পিতা অতি অল্প বয়সেই একাকী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিরূপে তিনি পয়সা করেন, তাহার অবশ্যই কোনও লিখিত ইতিহাস নাই। তবে

পাড়ার লোকেরা তাঁহার মাথার টাকের বড় প্রশংসা করিত। আর বৃদ্ধ ফিরিওয়ালাদের প্রতি তিনি বড় চটা ছিলেন। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহাদের একজন এক দিন তাঁহার বাড়ীতে নারিকেলী কুল বেচিতে যাইয়া, তাঁহার সহিত বহু দিনের পরিচিতের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। মামার পিতা তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, যে সময়ে মামার জন্ম, তখন তাঁহার পিতার অবস্থা খুব ভাল। মামার বিদ্যাশিক্ষার জন্য আয়োজন যথেষ্ট হইয়াছিল। বিদ্যালয় ব্যতীত বাড়ীতেও মামার শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু কেহই মামার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। বয়স হইবার পর, বিদ্যালয় অপেক্ষা রঙ্গালয়ের সহিত মামার সদ্ভাব অধিক হইয়া উঠে, এবং পটলডাঙ্গা অপেক্ষা বিডন ষ্ট্রীট্, গরাণহাটা, প্রভৃতি অঞ্চলে মামার গতিবিধি বেশী হইয়া পড়ে। পিতার মৃত্যুসময়ে মামার কলিকাতায় তিনখানি বাড়ী ছিল। মামা তাহার দুইখানি 'বিক্রমপুর' পাঠাইয়াছেন। অবশিষ্ট ভদ্রাসনটির কতকাংশ মামার আছে; অপরাংশের ভাড়া পাইয়া থাকেন। মামা সাধারণতঃ কোনও এক ভগিনীর সহিত বাস করেন। ছেলের বাজারে এত খাঁকৃতি, তথাপি মামার বিবাহ হয় নাই। মামার বয়স ২৫।২৬ বৎসর হইবে।

এতদিন মামা জাহানাবাদে পদ্মলোচন বাবুর সহিত ছিলেন। সেখানে মামার খাতির যথেষ্ট ছিল। মফঃস্বল জায়গায় ডাক্তারকে অনেকেই ভগিনীপতির ন্যায় সম্ভ্রম দেখাইয়া থাকেন। মামা

তাঁহারই শালা। সুতরাং, সে হিসাবে মামাকে ডেপুটি, সব-ডেপুটি মুন্‌সেফ, উকিল, প্রভৃতি অনেকেই ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন। মামা সুখের পায়রা—সংসারের ধার অতি অল্পই ধারেন। যেখানে ইয়ার্কি, সেইখানেই মামা। যেখানে একটু গান, বাজনা, সেইখানেই মামা। যেখানে তাস পাসা দাবা, সেখানেও মামা। যেখানে কোনও আমোদের মজলিস্, সেখানেই মামা। যেখানে সকাল বেলায় একটু চা খাওয়া হয়, সারাদিন তাওয়া দেওয়া তামাক চলে, সেখানেই মামা। সন্ধ্যা বেলায় যার বাড়ীতে ফুলবাগান আছে, তা'র বাড়ীতে মামা। মাথায় বাঁকা তেড়ী, মুখে ছাঁটা দাড়ি, বুকে ফুল গোঁজা, পায়ে ফুল মোজা, এ ক'টি মামার বার মাস, ত্রিশ দিন, চব্বিশ ঘণ্টা।

এইরূপে মামা হুগলীর ক্ষুদ্র মহকুমা জাহানাবাদ আলো করিয়া ছিলেন। কিন্তু এবার যখন পদ্মলোচন বাবু দু'মাসের বিদায় লইয়া আসেন, তখন মামা প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, পদ্মলোচন ফিরিলেও আমি ফিরিতেছি না। মামা জাহানাবাদের উপর চটিয়াছেন। মামার রাগের দুইটি কারণ ছিল; তন্মধ্যে একটিই গুরুতর, এবং মর্ম্মান্তিক। প্রথম কারণ এই যে, মামার বিদেশে জ্ঞানেন্দ্র নাম ফুটাইবার ইচ্ছা ছিল; জাহানাবাদে তাহা ঘটে নাই। পদ্মলোচন এবং তাহার গৃহিণী উভয়েই তাঁহাকে তিনকড়ি নামে সর্ব্বদা ডাকিতেন। অন্য লোকে জ্ঞানেন্দ্র বলিবে কেন? মামাকে অনেককেই অনেক সময়ে ঠাট্টা করিত—"তিন কড়াতেই এই, পাঁচকড়া ছকড়া সাতকড়া হ'লে

আর রক্ষা থাকিত না!” কিন্তু মামা ইহাও সহ্য করিতে পারিতেন। মামার জাহানাবাদ-ত্যাগের কিছু কাল পূর্ব্বেই একটি ঘটনা হয়, তাহাতেই মামা জ্বলিয়া গিয়াছেন। মামার বিশ্বাস, জাহানাবাদের সব-ডেপুটি বাবু তাঁহাকে বড়ই ভালবাসেন। সব-ডেপুটি বাবু অতিশয় কৌতুকপ্রিয় লোক। তাঁহার কাচারি ডাক্তার বাবুর বাসার নিকটেই ছিল। এক দিন এক ক্ষুদ্র ফৌজদারি মোকদ্দমার আসামী বলিল—“হুজুর, ধর্ম্মাবতার! বাদী গোপৃষ্ঠ করুক, মা-ভগবতীর পিঠ ছুঁয়ে বলুক, আমি ওকে মেরেছি, আমার যে শাস্তি হয়, আদালত দিবেন। আমি আর কোনও সাক্ষী চাই না।” বাদী কহিল, “হাঁ এ কথা আমি গোপৃষ্ঠ ছুঁয়ে বলিব। ইহার পর বাদীর মোক্তার যেমন কহিলেন, “তা হলে একটা গরু খুঁজে আনতে হয়,” অমনি সবডেপুটি বাবু এজলাস হইতে বলিয়া উঠিলেন, “বেশী দূরে যাবার দরকার নাই, দেখ ত, তিনকড়ি বাসায় আছে কি না। পদ্মলোচন বাবু বলেন যে, “তিনকড়ির যোড়া পেলে, তিনি একখানি গরুর গাড়ি করিতেন।” সমস্ত কাচারির লোক হাসিয়া উঠিল। সেই দিন সন্ধ্যাকালেই এ কথা জাহানাবাদের ক্ষুদ্র সহরে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। পদ্মলোচন বাবু নিজে তিনকড়ির সহিত বড় একটা ইয়ার্কি দিতেন না। রাত্রিতে আহারের সময়ে তিনি কহিলেন, “কি হে, সব-ডেপুটি বাবু কা'কে গোপৃষ্ঠ করাবার জন্য তোমাকে ডাকিয়েছিলেন আজ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ঘটনায় মামা মর্ম্মান্তিক দুঃখ বোধ

করিলেন। তিনি বরাবর ভাবিতেন, সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসে; এখন দেখিলেন, সকলেই তাঁহাকে উপহাস করে। ইহার পর, মামাকে একদিনও জাহানাবাদসমাজে প্রফুল্লভাবে বেড়াইতে দেখা যায় নাই। পদ্মলোচন ছুটী লওয়ায় মামার নিষ্কৃতিলাভ হইল।

এ হেন মামা সংপ্রতি আসিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্কন্ধে চাপিয়াছেন। প্রিয়নাথের মৃত্যুর কয়েক দিন পরে,তাঁহার দিদি তাঁহাকে আপিসে পাঠাইয়া দিলেন। সাহেব বলিয়াছেন, প্রিয়নাথের কোনও আত্মীয় উপযুক্ত থাকিলে, আমি তাহাকে কর্ম্ম দিব।

সাহেব কিন্তু মামাকে দুই একদিন দেখিয়াই তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং কহিলেন, প্রিয়নাথ বাবুর জামাতাকে পাঠাইয়া দিও। প্রিয়নাথের পীড়ার সময়ে সাহেব শরৎকে দেখিয়াছিলেন। মামা আসিয়া ভগিনীকে কহিলেন, "ও আপিসের চাকরি আমার পোষাবে না; গাধা-খাটুনি খাটিতে হয়। জামাই বাবুকে যেতে ব'লেছে।"

জামাই বাবুর সেবার আইন-পরীক্ষা দিবার কথা। ইহার পিতা-পিতৃব্য ইহা হইতে হয় ত কত আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু শরৎ, শাশুড়ী ও স্ত্রীর উত্তেজনায়, সে সমস্ত ভুলিয়া এক শত টাকা বেতনে আপিসের কর্ম্মে ঢুকিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করা অন্যায়; এমনও বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, বুক ঠুকে বল্‌তে পারিব যা ক'রেছি শ্বশুরের জোরে!



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।



অদ্য ২৭এ মাঘ, মঙ্গলবার, শরৎ আপিস হইতে সকাল সকাল আসিয়াছেন। সকাল বেলায় তিনি চিঠি পাইয়াছেন যে, ভবতারণ এবং প্রেমচাঁদ সস্ত্রীক পশ্চিম যাইতেছেন। গত কল্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন, আজ দিনের গাড়ীতে কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিবেন। সন্ধ্যার সময় শরতের বাসায় আসিবার কথা। শরৎ প্রাতঃকালে কাহাকেও এ কথা জানান নাই। কয়েক দিন হইতে তাঁহার শাশুড়ীর অসুখ হইয়াছে।

আর আর দিন শরতের বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হয়; আজ তিনি পাঁচটার পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত। রূপবতী সলিতা করিবার জন্য একখানি কাপড় ছিঁড়িতেছেন। কাপড়খানি

একটিমাত্র জায়গায় ছেঁড়া, কিন্তু এত শক্ত ছিল যে, সলিতা অপেক্ষা অন্য কোনও ভাল কাজে লাগিতে পারিত।

শরৎ কহিলেন, "আস্ত কাপড়খানা ছিঁড়ে সল্‌তে ক'চ্ছ ?"

রা। সলিতার কাপড় কি আমি বিয়োব ?

শ। ওর চাইতে একখানা বেশী পুরাণ কাপড় দেখে নিলেই চল্‌ত।

রা। সারাদিন ব'সে ব'সে ঐ দেখি আর কি ? বাক্স খুললেম, এই খানা সাম্‌নে পড়লো, তাই নিলুম। তোমার এখনও ছোট নজর যায় নি !

শ। এটা ছোট নজরের কথা নয়, হিসাবের কথা। যে কাপড়খানা ছিঁড়লে, ওখানা একটা গরীব দুঃখীকে দিলে সে পরিতে পারিত।

রা। গরীব দুঃখীকে দিলে, একখানা নূতনই দিব। ছেঁড়া কাপড় কেন দিতে যাই ? একবারে না দি, সে ভাল।

শ। আচ্ছা, যা বোঝ তাই। মা কেমন আছেন ?

রা। সে কথায় তোমার কাজ কি ? আমার মা ম'লেই বা তোমার কি, আর থাক্‌লেই বা তোমার কি ? হ'ত এদিশি জামাই, তা হ'লে দরদ্‌ বুঝত।

শ। মা'র অসুখ কি বেড়েছে ?

রা। বাড়েও নাই, কমেও নাই।

শ। মামা কোথায় ?

রূ। বেড়াতে গেছেন। ক'দিনের পর আজ একটু বেরিয়েছেন।

শ। মা, বাবা, কাকা, কাকীমা, এঁরা সব আজ আস্‌ছেন। কাশী যাবেন।

রূ। স্বর্গে গেলুম!

শরতের আজ কেমন এক সদিচ্ছা হইয়াছে, তিনি তাঁহার পিতা মাতা পিতৃব্য প্রভৃতিকে এক রাত্রি শ্বশুর বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। মনে করিলেন, এতদিন ওদের বাড়ী খেয়েছি, না হয় একদিন দুটি খাওয়ালেম। স্ত্রীর এইরূপ মিষ্ট কথা শুনিয়াও তিনি ক্ষণেক পরে কহিলেন, "মার অসুখ না হ'লে আজ ওঁদের এখানে থাকতে ব'লতাম।"

রূ। তা হোক! বল না! আমরা গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াব এখন!

শ। সব কথাতেই চট! আমি কি আর তোমাদের রাস্তায় দাঁড়াতে বল্‌ছি?

বলা বাহুল্য, শরতের উপার্জ্জনেই এখন এই কলিকাতার সংসার চলিতেছিল। তথাপি শরৎ যেন চোর!

রূপবতী উত্তর করিলেন, "রাস্তায় দাঁড়াতে বলা বই কি! উপরে তিনটি বই ত ঘর নয়। একটায় মা, একটায় মামা, একটায় তুমি। যায়গা হবে কোথায়? দু এক জন হ'লেও হ'ত। আসছেন যে পালশুদ্ধ!"

শ। কেন? তুমি মা'র ঘরে থাকতে! আমি, মামা, বাবা, কাকা, এক ঘরে শুতেম। না হ'লে, কেউ বা বৈঠকখানাতেও

থাক্‌তে পাত্তুম। মা আর কাকিমা এক ঘরে থাক্‌তেন। যা'ক, মা'র অসুখ, আর ও কথায় কাজ নাই!

রূ। তা হ'লই বা—আচ্ছা আক্কেল যা হ'ক!

ইহার পর, শরতের আর অভ্যর্থনা করিবার প্রবৃত্তি রহিল না। তাঁহাদের কথোপকথন শেষ না হইতেই, দুইখানি গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল। এক গাড়ীতে ভবতারণ ও প্রেমচাঁদ, অন্য গাড়ীতে শরতের মাতা এবং পিতৃব্যপত্নী। শরৎ তাঁহা-দিগকে যেরূপ আদর করিলেন, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে কেন? ভবতারণ তাঁহাদিগকে একরূপ জোর করিয়া সেখানে আনিয়াছিলেন। শরৎ ভরসা করিয়া একবার তাঁহাদিগকে গাড়ী হইতে নামিতে বলিতে পারিলেন না, পাছে ঘনিষ্টতার মাত্রা বাড়িয়া যায়। গাড়ীতে বসিয়া বসিয়াই দুই একটি কথা হইল। শরৎ যে আশঙ্কা করিতেছিলেন, ভবতারণ তাহা দূর করিয়া দিলেন। কহিলেন, "বাবা! এখন আমরা কালীঘাটে যাচ্ছি, দুই তিন দিন সেখানে থাকব। যেয়ে দেখা করো।" শরৎ অতি ব্যগ্রতার সহিত উত্তর করিলেন, "তা ক'রব।" ভবতারণের একবার মনে হইয়াছিল যে, সেই দিনই তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, কিন্তু তাহার শাশুড়ীর অসুখের কথা শুনিয়া তাহা বলিলেন না। শরৎ বাঁচিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী দুখানি দৃষ্টির বাহিরে গিয়া পড়িল। শরৎ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। রূপবতী তখন একটি হার্মোনিয়মে সুর দিতেছিলেন।

পাঠক জানেন, শরতের আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। তিনি যদি একবার বুক ঠুকিয়া বলিতে পারিতেন, "এ রাত্রিটা এখানেই থাকুন না", তাহা হইলেই তাঁহার জিৎ হইত। ভবতারণ কিংবা প্রেমচাঁদ, কাহারও সেখানে প্রবাস করিবার ইচ্ছা ছিল না। শরৎকে একবারমাত্র দেখিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা স্থির করিয়াই তাঁহারা আসিয়াছিলেন।





অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।



হার পর দিন অপরাহ্নে শরৎ অসামান্য উদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কালীঘাটে যাইয়া ভবতারণ ঘোষের 'সাক্ষাৎ প্রত্যর্পণ' করিলেন। আপিষ হইতেই তিনি একেবারে কালীঘাটে যান। পথে যাইতে যাইতে শরতের মনে অনেকরূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তিনি প্রথমেই ভাবিলেন, আমি আমার পিতা মাতার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা আমাকে বিস্মৃত হইতে পারেন। কিন্তু এখনও যেন বাবার সেই বাৎসল্যই রহিয়াছে। মা চটিয়াছেন বেশী। চটিবারই কথা! দেশে যাবার নামটি নাই! উহাঁদের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াও মনে করি না; অথচ বোধ হয়, এখনও শরীরের প্রতি রক্তবিন্দুই উহাঁদের যত্নের, উহাঁদের অর্থের।

রূপবতীর ইচ্ছা হইলে, আমার দেশে যাইতে তত আপত্তি নাই! কি করি, তা'র ত যাবার ইচ্ছা নাই; আর দেশে গেলেও নানা রূপ কথা উঠে। চালচলন ঢের তফাৎ যে। দেশ ত এখনও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। কেবল আমার গ্রাম বলিয়া নয়, বঙ্গের পল্লীগ্রামমাত্রেই।

শরৎ আবার ভাবিলেন, আজ, যাচ্ছি যেন কোনও অপরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে। কলেজে যখন পড়ি, তখনও বাবা, কাকা, এঁরা এসে কালীঘাটে থাক্‌তেন। সে সময়ে দেখা ক'র্ত্তে যেতাম কত আমোদ, কত স্ফূর্ত্তিতে; আজ মনে হ'চ্ছে,—গেলেই যেন কি কথা হয়, কি যেন জবাব দেই। বাড়ী যাবার জন্য জিদ্ ক'রবেনই। পড়া যে একবারে ছেড়ে দিয়েছি, তাও বোধ হয় জানেন না। এখনও টাকা ত পূর্ব্বের মতনই আস্‌ছে। শেষে মনে হইল, এক সুবিধা হ'চ্ছে, বুড়ো বুড়ীরা সব বাড়ী থেকে যাচ্ছেন, এখন বোধ হয় দেশে এক এক বার যেতে রূপবতীরও আপত্তি হবে না। সে ছিল সর্ব্ব সাবেকী; দিনের বেলায় বাড়ীর ভেতর রূপবতীকে নিয়ে একটু ব'সে থাকবার যো ছিল না। এখন দাদা বাড়ীর কর্ত্তা। দাদা ত আমার শিব! আমার ভাইএর মত ভাই কি কারো হয়? আর দাদার স্ত্রী, তিনি ত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, মুখে কথাটি নাই। বাস্তবিক, লেখা পড়া না জেনে, মেয়েমানুষ অত ভাল হয়, এ আমার ধারণাতেই আসে না। তা দেশেই যাই, যাই করি, আর দু একবার—বাস ক'র্ত্তে হ'বে কলকাতায়। যত বড় লোক, সবই ত কলকাতায়।

থাবার দাবার সুখ সুবিধা, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আমোদ প্রমোদ, যা কিছু কলিকাতায়। মফঃস্বলে রাজা হ'য়ে থাকবার চাইতে কলকাতায় গরীব ভাবে থাকাও ভাল। মা, বাবা, কাকা, এঁরা যদি চলে গেলেন, তবেই ত আমি স্বাধীন! বিষয়?—তা কলকাতার লোকের কি মফস্বলে বিষয় থাকে না? মা বাপের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আমাদের দেশেই বেশী। সে কেবল দেশের লোক পূর্ব্বে ঘরের বা'র হ'ত না ব'লে। ধ'র্ত্তে গেলে, প্রত্যেকের জীবনই পৃথক্, দায়িত্বও পৃথক্। স্বামী, স্ত্রীর যে মিলন, তাহাই অবিচ্ছেদ্য। ইংরেজেরা যে আমাদের রাজা, তাহার কারণই এই। মা বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ তা'দের ক'দিন? কিন্তু, স্ত্রীর সম্ভ্রম যদি কেউ জানে, সে ইংরেজ। হাজার হ'লেও আমাদের বাঙ্গালীর কুলে জন্ম,—কেমন এক রকম—তা নইলে আর একটু কাপড়-ছেড়া নিয়ে রূপবতীর সঙ্গে ঝগড়া করি?

ফলতঃ, শরৎ যতই কালীঘাটের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন, মনে মনে তিনি ততই পিতা মাতা হইতে দূরে যাইতেছিলেন। একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ভবতারণ অবস্থিতি করিতেছিলেন। শরৎ যখন সেখানে পহুঁছিলেন, তখন প্রেমচাঁদ বাসায় ছিলেন না, কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন। ভবতারণ দুই একটি কথা কহিয়াই শরতকে কহিলেন,—"যাও বাড়ীর ভিতর যাও!"

শরতের এইবার যেন লজ্জা অধিক হইল। যাবেন কিন্তু জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে। শরতের মনে হইল, গত কল্য মা তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই।

মৃদুপাদবিক্ষেপে শরৎ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেখেন, তাঁহার মাতা এবং পিতৃব্যপত্নী উভয়ে একত্র বসিয়া আছেন। শরৎ যাইয়া উভয়কেই নমস্কার করিলেন।

শরতের মা কহিলেন, "বড় ভাগ্য আমার!"

প্রেমচাঁদের স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "মা'র পায়ে নমস্কার, এও আশ্চর্য্য বুঝি?"

শরৎ কথা কহিতে পারিলেন না।

শরতের জননী উত্তর করিলেন, "মা,—মা ওর কে? মা সেই প্রিয়নাথ বোসের স্ত্রী। তা'রই জন্যে মানুষ করেছিলেম, তা'কেই দিয়েছি। সেই মরুক, তারই শ্রাদ্ধ করিবে। আমরা ওর কে? ভুলে নমস্কার ক'রে ফেলেছে!"

শরতের মস্তক অবনত। ঝি আসিয়া তাঁহাকে একখানি বসিবার আসন দিয়া গেল। শরৎ বসিলেন।

প্রেমচাঁদের স্ত্রী পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "বাবা, এখন যেন কল্‌কাতা চিনেছ—কল্‌কাতায় এসেছ—জন্ম ত সেই বাজিৎপুরে, মানুষ ত হ'য়েছ সেখানে! এত বড় হয়েছ সেই মাটীতে—শ্বশুর শাশুড়ী ত হ'য়েছে আজ্‌কাল! এক একবার আমাদের মনে ক'র্‌লে দোষ কি? রাজার সংসার তোমার—তুমি থাক শ্বশুরবাড়ীতে—লোকে বলে কি?"

প্রেমচাঁদের পত্নী এমন ভাবে শরতের সহিত পূর্ব্বে কখনও কথা কহেন নাই। আজ তাঁহার এবং তাঁহার মাতার ভাব দেখিয়া তিনি যেন ঠিক মধ্যস্থের ন্যায় কথা কহিতে লাগিলেন।

শরৎ পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ। তিনি যেন কিছু কহিতে চাহেন, কিন্তু কথা বাহির হয় না।

তাঁহার মা কহিলেন, "কাকে বল্‌ছিস্ বোন, ও কি আর ওতে আছে? যাদু করেছে ওকে। জ্ঞান থাকলে কথা বুঝ্‌ত। যেমন ভাব হয়েছে ওর, ও যে আমি মরবার সময়ে যেয়ে চোখের দেখাটা দেখ্‌বে, তাও বোধ হয় না। চল্লুমই ত সংসার ছেড়ে—দুই ছেলে দুই বৌ নিয়ে ঘর কর্‌ব—সে সাধ মিটেছে—যাক্, যেখানেই থাকে, ভাল থাক্—আর কি বলব?"

শরতের মাতার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শরৎ মনে করিতে লাগিলেন, পালাতে পাল্লে বাঁচি; এ আর দেখা যায় না। এই সময়ে প্রেমচাঁদের স্ত্রী উঠিয়া যাইয়া শরতের জন্য জলখাবার সাজাইয়া আনিলেন, এবং রেকাবটি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন, "খাও বাবা, আমরা তোমার শাশুড়ীর মত ভাল খাবার কোথায় পাব?"

শরৎ বাক্যব্যয় না করিয়া জলখাবার উদরস্থ করিতেছেন, এমন সময় ভবতারণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রেমচাঁদের পত্নী উঠিয়া গেলেন। ভবতারণ কহিলেন, "শরৎ, আজ থাক না এখানে।"

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "থাক্‌বে কোথায়? পরের বাড়ী বেড়াতে এসেছে বই ত নয়, নিজের বাড়ীর খবর নের কে?"

শরৎ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া এইবার কথা কহিলেন—"ব'লে

আসি নাই, আর আমার—শাশুড়ীর বড় অসুখ। কা'ল আস্‌ব আমি।"

ভ। কা'ল আমরা চলে যাব। তুমি পার ত এখানে না এসে একবার হাবড়া ষ্টেশনে যেও। মনে করেছি বাঁকুড়া হ'য়ে একবার সুরিকে দেখে যাব। সেখানে দু'একদিন দেরী হবে।

শ। তা আমি হাবড়াতেই যাব।

এই বলিয়া একটা পান মুখে দিয়াই শরৎ পিতা মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। ইহা যে গমনের উদ্যোগ, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে কেন? ভবতারণ কহিলেন, "মধ্যে মধ্যে দেশে যেও। শ্যামাচরণ একলা রইল। প্রেমচাঁদের আর ফের্‌বার ইচ্ছা নাই। বউমাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌বে,—আজ হ'ক কা'ল হক, যেতে ত হবে। দেশ ত সেই। আর কাশী থেকে আমার কি প্রেমচাঁদের চিঠি পেলেই সেখানে যাবে। আমি আর বেশী দিন থাক্‌ব, এমন বোধ হয় না।"

কথা কয়টি শরতের বুকে বাজিল। মানুষ ত? শরতের মনে হইল, পিতা আমার প্রতি একদিনের জন্য কোন কঠোর ব্যবহার করেন নাই; কখনও আমাকে একটী তীব্র বাক্য বলেন নাই।

শরৎ! এমন ভাবে দোষ ভুলিয়া যাইতে—এত সহজে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে—পিতা মাতা ব্যতীত সংসারে আর কেহই নাই!

শরতের অপাঙ্গে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

ভবতারণ হস্ত দ্বারা তাহা মুছিয়া কহিলেন,—"কেঁদ না। ভেবে দেখলে তোমার মতন সুখী কে? বুদ্ধি স্থির কর। বৌমাকে বুঝাও। যে ভাই তোমার—বড় বৌমাও আমার লক্ষ্মী—কোন দিন তোমায় অনাদর করবেন না। আর যা রহিল তোমার—দেখে শুনে চল্‌লে কোন দিনই তোমার অভাব হবে না; চাকরী বাকরী করবারও দরকার হবে না।"

জগতে যাহারা শৈশবে বা বাল্যে পিতৃহারা, তাহারা পিতার এমন বাৎসল্য এবং উপদেশে বঞ্চিত। সংসারে এমন ভাগ্যহীন লোকের সংখ্যা অল্প নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা জ্ঞান লাভ করিয়াও এমন পবিত্র স্নেহের অধিকারী, তাহাদের অনেকেই শরতের ন্যায় ইঁহার মূল্য বুঝে না।

শরৎ নম্রমুখে বিদায় হইলেন।

তিনি চলিয়া যাইবামাত্র গৃহিণীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার ক্রোধ এবং অভিমান শরতের প্রতি না যাইয়া এখন ভবতারণের প্রতি ধাবিত হইল। তিনি আরম্ভ করিলেন, "তোমার জন্যেই সব। সে সময়ে কল্‌কাতায় ছেলের বে না দিলে আর এত ফল ভোগ কর্ত্তে হ'ত না।"

ভবতারণ কহিলেন, "বিবাহ কি তোমার আমার হাত? জন্ম মৃত্যু বিবাহ বিধিলিপি।—"

গৃ। তোমার ত সবই বিধিলিপি। বাছা আমার—বাছাকে একটি ভাল মুখে কথা কই নাই। যতক্ষণ ছিল, কেবল বকুনি শুনে গেছে। কি খেলে না খেলে, তাও দেখলাম না। চোরের

মতন উঠে গেছে। মুখ তুলে একটি কথাও কয় নি। ওরে মানুষে কি করেছে—বউয়ের মুখ দেখলেই সব ভুলে যায়।

গৃহিণী আবার কাঁদিলেন।

ভ। চুপ কর। দেখ, ঐ ছেলেরই বুদ্ধি ফিরবে, বাড়ী যাবে। সংসার কর্ব্বে। আমরাই দেখে যেতে পারলাম না।

ইহার পর দিন নিরূপিত সময়ে শরৎ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। পিতা মাতা পিতৃব্য প্রভৃতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তিনি বাসায় ফিরিলেন। শরতের এই এক দিনের ব্যবহারেই যেন সকলে সন্তুষ্ট। গাড়ীতে তাঁহারা অনেকক্ষণ কেবল তাঁহার কথা বলিতে বলিতে গিয়াছিলেন।





ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।



ঠক, আশুতোষের স্বভাবের পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। এখন তাহার দুই একজন সঙ্গীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করুন। বাঁকুড়ায় আশুতোষের সঙ্গী অনেক। বাঙ্গলার কোন্ জেলায় বা কোন্ প্রধান স্থানে এরূপ লোকের সঙ্গীর অভাব? অনেক স্থলেই বরং একই যায়গায় একাধিক দল দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ত দেশের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে।

বাঁকুড়ায় আশুতোষের দলে আরও লোক থাকিলেও, আশুতোষই দলের চাঁই। তিনিই একমাত্র নাম কাটা সিপাহী। অন্য যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বর্ণ-চোরা। দু'এক জন বাহিরে ভালমানুষ বলিয়াই পরিচিত। অনেক সময়েই তাঁহারা ডুব দিয়া জল খাইয়া থাকেন। সুতরাং একাদশীর বাপেরও সাধ্য নাই যে, তাহা টের পান।

প্রধান আড্ডাই আশুতোষের বাড়ীতে। সেখানে তাঁহারা সুযোগ দেখিয়া দু এক দিন আসিয়া থাকেন। কেবল দুই জন লোক অপেক্ষাকৃত পরিচিত, এবং বাঁকুড়ার সমাজে আশুতোষের পরেই ইঁহাদের নাম হইয়া থাকে। ইঁহারা আশুতোষের বাসায় প্রায়ই আসেন; সহরে থাকিলে তাঁহাদের সন্ধ্যাকালে সেখানে আগমন অবর্জ্জনীয়। আমরা যথাসম্ভব ইঁহাদের সহিত পাঠকের পরিচয় করিয়া দিতেছি। প্রথম, বাবু শিবরত্তন মজুমদার পুলিশ ইন্স্পেক্টর। ইঁহার বেতন মাসিক দুই শত টাকা। কিন্তু বাঁকুড়ায় আসা অবধি মদের খরচটা আশুতোষের উপর দিয়া যাইতেছে। শিবরতন বাবু পুলিসের একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত। আর কিছু হউক না হউক, অবয়ব তাঁহার পুলিসের কার্য্যোপযোগী, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। তাঁহার দৈর্ঘ্য অষ্টাদশ ইঞ্চি মাপের ছয় ফুটেরও অধিক। আর উদরের পরিধি পঞ্চাশ ইঞ্চির ন্যূন নহে।

শিবরতন বাবু কখনও ঘুস খান না বলিয়াই তাঁহার আরও নাম। যে বেতন পান, তাহাতেই অতি কষ্টে তিনি সংসার নির্ব্বাহ করেন। মাসের শেষে প্রায়ই তাঁহাকে দু' চারি টাকা ধার করিতে হয়। ডেপুটি, সবজজ্ ইঁহাদের নিকটেই তাঁহার ধার। তাঁহারা বলেন, শিবরত্তন বাবুর দু'শ টাকাতেও চলে না। ইহার উপর ক্রিয়া কাণ্ড। মাতৃশ্রাদ্ধ, পিতৃশ্রাদ্ধ, কন্যার বিবাহ প্রভৃতিতে যে ব্যয় লাগে, তাহা কোথা হইতে আসিবে? এ সকল কাজে নিম্নস্থ পুলিস কর্ম্মচারীরা বা দেশের জমিদারগণ,

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলে তাহা গ্রহণ করিতে বাধা কি? সে বারে শিবরতন বাবুর কন্যার বিবাহ হইল, তাহাতে জেলার জমিদার মহাজনেরা কেহ এক শত, কেহ দুই শত করিয়া টাকা উপঢৌকন দিয়াছিল। ভদ্রলোকে দিলে তাহা কি ফেরত দিয়া তাহার মনে কষ্ট দেওয়া যায়? আর অধীনস্থ কর্ম্মচারী, তাহারা ত সকলেই পরিচিত। শিবরতন বাবুর বন্দোবস্ত ছিল, এক এক থানার দারোগা, কেহ ঘৃত, কেহ চাউল, কেহ বা দাইল তরকারি পাঠাইতেন। একজনের উপর অধিক চাপ তিনি কখনও দিতেন না। এ ছাড়া মফঃস্বলে গেলে আহারীয় অথবা সেবনীয় যাহা কিছু, তাহা তাহাদিগকেই দিতে হইত। পাথের পাল্‌কী ভাড়া ইত্যাদিও দারোগা বাবুদের স্কন্ধে পড়িত। একবার এক জন দারোগা বাবু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, রসদ যোগাইতেই মারা পড়িলাম। কিন্তু শিবরতন বাবুর উদারতা ছিল। অনেক সময়ে জিনিষ সংগ্রহ করিতে না পারিলে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা আহার মূল্য দিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন। শিবরতন বাবুর আহার অপেক্ষা পানের বন্দোবস্ত অধিক ছিল। মফঃস্বলের এক থানায় গিয়াছেন, সন্ধ্যাবেলায় ফরমাইস হইল কিছু লেমনেড্। দারোগা বাবু টাকা দিয়া বাজারে লোক পাঠাইলেন; লেমনেড্ পাওয়া গেল না। লোক ফিরিয়া আসিলে, তিনি ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে অবস্থা জানাইলেন। শিবরতন বাবু বলিলেন, "হাঁ! পয়সা হ'লে আর মেলে না? পাঠিয়েছেন একটা গর্দ্দভকে দিন দেখি আমার নগরবাসীকে পাঠিয়ে!" নগরবাসী ইন্‌স্পেক্ট-

রের আরদালি কনষ্টেবল। সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে। নগরবাসী পয়সা লইয়া বাজারে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে লেমনেডের বোতল শিবরতন বাবুর সম্মুখে। দারোগা অপ্রস্তুত! নগরবাসী ভিন্ন আর কেহ কিন্তু সে বাজারে সে দিন লেমনেড্ খুঁজিয়া পাইত না। দু তিন বার এইরূপ হইবার পর, দারোগা বাবুর মনে সন্দেহ হইল। শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল, মদ কিম্বা লেমনেড্ ইনস্পেক্টরের বাক্স হইতেই বাহির হয়। তাহা বাঁকুড়া হইতেই আসে। কেবল দারোগা-প্রদত্ত পয়সাগুলি তাহাদের স্থান অধিকার করে। একবার শিবরতন বাবু এক থানা পরিদর্শন করিতে যান। এই থানার দারোগা বাবু ঘি পাঠাইতে বাধ্য; কিন্তু দু তিন মাস তাহার সে উপঢৌকন শিবরতন বাবু পান নাই। পরিদর্শনপুস্তক হাতে করিয়াই তিনি খিটিমিটি আরম্ভ করিলেন। "আর এ বাঙ্গলা লেখাপড়ায় কাজ চলে না, আমি করিব কি? আর বাঁচাব কত?" এইরূপ ধরণে কথার অর্থ দারোগা বাবু বুঝিতে পারিলেন। তিনি ইংরাজী জানিতেন না। কিন্তু চতুরতায় তাঁহার সমকক্ষ বাঁকুড়া পুলিসে কেহ ছিল না। ইন্সপেক্টরের তিরস্কারের অর্থ বুঝিয়া তিনি অবিলম্বে বাহিরে গেলেন, এবং সজোরে দেয়ালের উপর চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "শালা চৌকীদার, আজ ছ মাস ধ'রে তোকে ব'লছি ঘি আন্‌তে,—এখন আমার যে সর্ব্বনাশ হয়, শালা, তুই দিবি না তোর বাপ দেবে? পয়সা দেব আমি? শালা, বজ্জাত!" কথাগুলি ইন্‌স্পেক্টর বাবুর কাণে গেল। তিনি

দারোগা রামনিধি বাবুকে ডাকাইয়া সুর নরম করিয়া কহিলেন, "আরে ও রামনিধি বাবু! ভিতরে আসুন, ছেড়ে দিন ওকে। সত্যি সত্যি আমি কি আপনার বিরুদ্ধে কিছু লিখিতে পারি? কখনও দেখেছেন আমার দ্বারা কোন অধীনস্থের অন্ন মারা গিয়াছে!" রামনিধি বলিল, "আজ্ঞে না, তাতেই ত আরো দুঃখ হয়। এমন মনিব কি আর পাব? যা শালা যা, কালকের দিনের মধ্যে যদি ষোল সের ঘি এনে হাজির না করিস, ত তোর মাথা এক দিকে, আর আমার জুতো এক দিকে।" নির্ব্বোধ দেঁয়ালকে শেষ সম্বোধন করিয়া রামনিধি ঘরে ফিরিলেন, এবং আপনার রক্তহস্ত দেখাইয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে সন্তুষ্ট করিলেন। পরিদর্শন-মন্তব্য রামনিধির অনুকূল হইল, ইহা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় ইয়ার সবডেপুটী ভবনাথ বাবু। সবডেপুটী বাবুর বিদ্যা অতি সামান্য, কিন্তু তৈলের জোর বড়ই অধিক। আর তৈলপ্রদানের ব্যবস্থাও তাঁহার উত্তম জানা ছিল। এই তাঁহার গুণ, বাকি প্রায় সমস্তই দোষ। ভবনাথ সবডেপুটী হইয়াছেন, এই তৈলের জোরে; এখনও চাকরী রাখেন, এই তৈলের জোরে। সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান অতি অল্প। দেখিতে চেহারা বেশ পরিপাটী, কিন্তু একবারেই অন্তঃসারশূন্য। বাঁকুড়ায় অনেকেই তাঁহাকে মাখাল্ বাবু বলিয়া ডাকিত। বঙ্কিম বাবু মনুষ্য-ফল মধ্যে, কতকগুলিকে মাখাল্‌ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভবনাথ বাবু এই শ্রেণীতে প্রধান স্থান পাইবার যোগ্য। মনুষ্য-স্বভাবে দোষ যাহা কিছু থাকিতে পারে, তাহার

অনেকই তাঁহাতে ছিল। কিন্তু বাহ্যিক চেহারা বেশ চাকচিক্যময়। সাধারণ লোকে তাঁহাকে বীচিগণা বাবু বলিয়া জানিত। সবডেপুটি বাবু নিজে বাজার করিতেন। এক দিন বাজারে যাইয়া তিনি কুষ্মাণ্ড খরিদ করিতে যান। একটি স্ত্রীলোক একটা কুমড়াকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক অংশের মূল্য এক পয়সা। সবডেপুটি বাবু, এক পয়সায় এক অংশ খরিদ করিলেন। স্ত্রীলোক বীচি গুলি পৃথক করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। মারামারি লাগিল এই বীচি লইয়া। সবডেপুটী বাবু বলেন, "দে, এখন আমার অংশের বীচি গুলি দে।" স্ত্রীলোকটি বলে, "বীচি আমি পৃথক বেচিয়া থাকি।" ভবনাথ বাবু সে কথা শুনিলেন না। তিনি কহিলেন. "তা হবে না। আমার ভাগের কুমড়া টুকুর গায়েও অবশ্য বীচি ছিল, তুই হিসাব করে দে। আট ভাগ করেছিস—বীচি যত গুলা আছে, তার আট ভাগের এক ভাগ আমাকে দে।" স্ত্রীলোকটি ভদ্রলোক দেখিয়া কহিল, "আমি অমনি গুটিকতক দিচ্ছি, নিয়ে যান।" ভবনাথ বাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। সঙ্গে যে লোক ছিল, তাহাকে দিয়া বীচি গণাইলেন, এবং তাহার আট ভাগের এক ভাগ লইয়া আসিলেন। বাড়ীতে এই বীচি লাগাইলে আর কুমড়া কিনিতে হইবে না, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার পর তিনি যে দিন বাজারে যাইতেন, দোকানদারেরা বলাবলি করিত, "ঐ সেই বীচিগণা বাবু আসচে!"

আশুতোষের সঙ্গে ভবনাথের বড়ই ভাব।



বিংশ পরিচ্ছেদ।



বতারণ এবং তাঁহার গৃহিণী প্রভৃতি বাঁকুড়া হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী শনিবারে আশুতোষের বাসায় ভরপুর মজলিস্। এ কয়েক দিন আশুতোষ যেন কয়েদীর ন্যায় ছিলেন। শিবরতন, ভবনাথ, আজ দু'জনেই যেন একটু মনমরা। কিছুকাল পরে শিবরতন আরম্ভ করিলেন, "আর, ভায়ার এখানে একটা আড্ডা ছিল, দু এক দিন আসা যাওয়া ছিল, তাও এবার বন্দ হ'ল।"

আ। কেন? কেন?

শি। ভায়া এবার গৃহস্থ হলেন। গৃহিণী এসেছে ত? আর ক'দিন? এখনও ছোলা খাওয়াতে শেখান নি, তাই। একবার আপনার গণ্ডা আপনি বুঝে নিলেই তোমাকে দাঁড়ে বসাবেন, তখন কি আর আমাদের আমল দেবে?

আ। না ভাই! তেমন নয়। এই ত এত দিন এসেছে, এক দিনও সে রকম কিছু দেখি নি। আমার মতন আমি আছি, তার মতন সে আছে।

শি। প্রথম দু চারি দিন ঐ রকমই চলবে। শেষে কিন্তু শেকলটি পরালে টেরও পাবে না। কেবল রাধাকৃষ্ণ পড়বে।

আ। কি. করব ভাই, আমিও পত্রপাঠ দিচ্ছিলুম তাড়িয়ে, কিন্তু পায়েপড়াকে পারা ভার।

শি। তা কি আর বলছি, তামাসা কচ্ছিলুম. স্ত্রী নিয়ে ঘর করবে, সে ত সুখের বিষয়।

আ। তা নয়, রেখেছি এই সর্ত্তে—যে দিন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কথা বল্‌বে, সেই দিনই গলা ধাক্কা।

ভ। ছিঃ, অত কড়া হ'লে চল্‌বে কেন? পশুদের প্রতি অত্যাচার নিবারিণী সভা নালিস কর্‌বে যে।

শি। না হে! অমন কথা বলো না। ভায়ার বউটি শুনেছি বাস্তবিকই ভাল।

ভ। সেই পাড়াগেঁয়ে মহাজনের মেয়ে ত?

শি। মহাজন কেন? তাদের জমিদারীও আছে। (আশুর প্রতি) বউটি দেখতে কেমন ভাই?

ভ। দাঁড়কাকের মতন।

শি। ঠাট্টা কর কেন?

ভ। দাঁড়কাকের চাইতে ভাল!

শি। ঢের।

ভ। তুমি জান্‌লে কেমন করে?

শি। বাবা, পুলিসকে জিজ্ঞেস কচ্ছ, খবর জান্‌লে কেমন করে?

ভ। এখানে ত চুরি ডাকাতি হয় নাই।

শি। ইঞ্জিনিয়ার রামদয়াল বাবুর বাসায় গিয়াছিলেন; তাঁর পরিবার গল্প করেছেন আমার স্ত্রীর কাছে।

ভ। শোনা কথা প্রমাণই নয়। চাক্ষুষ সাক্ষী দাদাই রয়েছে; বল না দাদা?

আ। দেখতে মন্দ নয়, আর গুণ এই যে, বড় নরম।

ভ। তা হলে গিন্নিটি ঘোর কালো নয়।

শি। বেশ কথাটি মনে করেছ! ডি, এল্ রায়ের ঐ গান-টিই গাও একবার।

ভ। খালি পেটে?

শি। খালি পেটে কেন! রাত ত পুইয়ে গেল বাজে কথায়।

ভ। ডাক তা হলে শিবেকে।

আ। শিবে!

চাকর 'আজ্ঞে যাই' বলিয়া উত্তর করিল।

শিবে আসিলে আদেশ হইল, "এক বোতল হুইস্কি আর দু বোতল লেমনেড নিয়ে আয়। গেলাস একটা, আর কর্কস্ক্রুটা।"

ভৃত্য আদেশ প্রতিপালন করিল।

তিন জন পান করিয়া গান ধরিলেন।

"আমরা তিনটি এয়ার, দাদা আমরা তিনটী এয়ার!
আমরা তিনটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার,
কিন্তু পার করি সুধু বোতল গেলাস, আমরা তিনটি এয়ার॥
দেখ ব্রাণ্ডি মদের রাজা আর সেরি মদের রাণী,
আমরা করিনে কাহারে ডর, করিনে কারও হানি;
আমরা রাখিনে কাহারও তোয়াক্কা, করিনে কাউকে কেয়ার,
এই ভব মাঝে সকলি ফক্কা, জেনেছি আমরা তিনটি এয়ার!
মোদের দিও নাকো কেউ গালি, মোদের কর না কেউ মানা,
আমরা খাইনে কারও চুরি করে দুগ্ধ ননী ছানা।
কেবল লুটিব একটু মজা, আর করিব একটু পান
কেবল হাসিব একটু, নাচিব একটু, গাইব দুটা গান!
কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে বল দেখি দাদা?
কারণ দেবতা খেত লাল পানি আর দৈত্য খেত সাদা।
কেন বাঙ্গালী গুলো কালো আর ইংরেজ গুলো গোরা?
কারণ বাঙ্গালী খায় সুধুজল আর সাহেবে খায় সুরা!
কেন নদীর জলে কাদা রে ভাই সাগর জলে নুন?
পাছে মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন!
কেন তুমি বা না হলে কবি হল সেক্সপীয়ার?
সে কথা আর কাজ কি বলে আমরা তিনটি এয়ার!
এই জীবনটা ঘোর মেঘলা আর গিন্নিটি ঘোর কালো!
এ ভব-অন্ধকারে রে ভাই সুরাই একটু আলো।

এ ভব মরুভূমি মাঝে সুরাই নির্ঝর,
এ ভবারণ্যে জীবন-ঝঞ্ঝার সুরাই পাকা ঘর!" * ইত্যাদি।

ইহার পর রীতিমত নরকের অভিনয় আরম্ভ হইল। আমরা তাহা দেখাইতে পারিব না।

সুরবালা বাড়ীর ভিতরে থাকিয়া প্রায় সমস্তই শুনিতেছেন। মুখে কথাটি নাই। তিনি যেন সে বাড়ীর কেহই নহেন।

* আমরা উপরে যে পদগুলি দিলাম, কল্কি-অবতারে এই গানটিতে তাহা নাই শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মুখে কিন্তু আমরা পূর্ব্বে এ গানটি এইরূপই শুনিয়াছি। জীবিত কবি তাঁহার অনেক গানেই এমন পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।





একবিংশ পরিচ্ছেদ।



ত্রি ২ টার পরে আশুতোষ অন্দরে নীত হইলেন। নীত হইলেন, কেন না, চলিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। বাড়ীতে ঝি, আর সুরবালা। বৃদ্ধা ঝি অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরবালা এখনও অনিদ্রিত। স্বামীর আহার হয় নাই। সুরবালা ভাত কটি গরম রাখিবার জন্য হাঁড়ীতে জল চড়াইয়া বসিয়া আছেন। ভবনাথও শিবরতনের গমনের পদশব্দ পাইয়াই হাঁড়ীতে চাল ঢালিয়া দিলেন। স্বামীকে তদবস্থ আসিতে দেখিয়া তিনি শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং কহিলেন, "আজ্ আবার হয়েছে ?"

আ। হবে না ; তোমার খাই, না তোমার বাপের খাই ?

সুরবালা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চক্ষু

দিয়া দু'ফোটা জল পড়িল। স্ত্রীলোকের বাপ তুলিলে প্রাণে বড় লাগে।

আশুতোষ সেই রাক্ষস মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। মুখে খই ফুটিতে লাগিল। "নাই পেয়ে গেছে আর কি! দু'দিন একটু ভাল মুখে কথা বলেছি বলে ঠাউরেছে, এইবার যা বল্‌ব, তাই হবে। তেমন ছেলে পাওনি, বাবা! ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি,—ঘরের মেয়েমানুষ আবার মুখ চেয়ে কথা কইবে? অমন মেয়ে মানুষের মুখে ঝাঁটা পড়্‌বে না?" সুরবালা মনে মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি কিছু-মাত্র রুষ্ট না হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, পুড়ক আমার মুখে ঝাঁটা, তুমি শোও দেখি একটু।"

আ। শোব তোমার কথায় নাকি? ওরা যা বলেছে মিথ্যা নয়, যে দু দিন পরেই দাঁড়ে বসিয়ে ছোলা খাওয়াবে।

সু। আমি দাঁড়ে বসাতেও চাইনে, ছোলা খাওয়াতেও চাইনে। তুমি শোও দেখি। বক্‌লে আরও অসুখ বাড়্‌বে।

সুরবালা স্বামীর অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র—লিখিতে কষ্ট হয়—আশুতোষ সেই সাধ্বী রমণীকে পদাঘাত করিলেন, সুরবালা ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ওষ্ঠ কাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। রমণী মুহূর্ত্তমাত্র ক্ষতস্থানের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই পুনরায় সেই পশুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পদাঘাতের উদ্যমেই আশুতোষ স্বয়ং পতিত হইয়াছিলেন, এবং পতনের অব্যবহিত

পরেই বমন আরম্ভ করিলেন। সুরবালা নিজের ব্যথা ভুলিয়া গিয়া স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ইহাদের গোলযোগে বামা জাগিয়াছে; সে সুরবালাকে উদ্দেশ করিয়া আরম্ভ করিল, "একশ বার বারণ কল্লুম, তা শুনলে না; এই ঝাঁটা নাতি খাবার জন্যে এখানে না এলেই নয়। হচ্চে ত ঝাঁটা নাতি রোজই, বাপের বাড়ী কি দু'মুটো অন্ন যুটে না? শুনি, তাদের অন্ন কত লোকে খায়।"

সুরবালা আস্তে আস্তে কহিলেন, "ঝি, চুপ কর।"

বা। আমি ত চুপ করেই আছি।

সু। ওঁর কি জ্ঞান আছে?

বা। জ্ঞান ত এখন নাই. মারবার সময় ছিল, আর ছাই মাথামুণ্ড যখন খেয়েছিল, তখনও ছিল।

সুরবালা আরও আস্তে কহিলেন, "জ্ঞান থাকলে কি আর মারেন।"

বা। জ্ঞান থাক্ আর না থাক্, তুমি থাক ওরে নিয়ে, আমি পারব না। কালই আমি আমার পথ দেখি, ও যখন পাঁচ বছরের, তখন এসেছি ওদের বাড়ীতে; আর সেও আজ এক কুড়ি তের বছরের কথা, সে দিনও ওর মা মরবার সময়ে বলে গেল, ঝি আমার আশুকে দেখো। ঝির কি অসাধ? আমার কি কেউ কোনখানে আছে? ভেবেছিলুম যে কদিন বাঁচি, এখানেই পড়ে থাকব; তা বাবা, এমন আমার চৌদ্দ পুরুষেও দেখি নাই। তুমি ঝাঁটা খাও, নাতি খাও, আর অমনি

করে বসে মাথায় বাতাস দাও, আমি আর এ দেখতে পারি না।

সু। ঝি, আমার অদৃষ্ট! তুমিও আমায় ফেলে যাবে?

সুরবালার চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

বামা একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল; কহিল, ইচ্ছায় কি তোমায় ফেলে যাই? তোমার কষ্টই আর দেখতে পারি না, এ কালে কি তোমার মত মেয়ে হয়? ভগবান জানেন, আমার পেটের মেয়ে থাকলেও আমি তারে বেশী ভাল বাসতে পার্ত্তাম না। তোমার কষ্ট দেখেই বুক ফেটে যায়।"

সু। আমার কষ্ট যদি পরমেশ্বর ঘুচান, তবেই ঘুচবে; নতুবা মানুষের সাধ্য নাই। বাপের বাড়ী গিয়ে রাজভোগ খেয়েই কি আমায় সুখ হবে? তার চাইতে এখানে অনাদরে উপোস করে থাকাও ভাল।

বা। তোমার কষ্ট থাকবে না, ভগবান তোমাকে সুখী করবেন!

সু। আমার ব্যথার যদি কেউ ব্যথিত থাকে, সে তুমি। শ্বশুরবাড়ী এসে অবধি কেবল তোমার জন্যে আমার যে শাশুড়ী নাই, তা আমি বুঝতে পারি নাই। তুমি আমায় ছেড়ে যাবে?

বা। আমি প্রাণ থাকতে তোমায় ছেড়ে যাব না।

বামা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

সুরবালার সে রাত্রিতে নিদ্রা প্রায় হইল না।

পরদিন নিদ্রা হইতে উঠিয়া ক্ষণকাল পরেই আশুতোষ সুরবালাকে কহিলেন, "পঞ্চাশটি টাকা দাও আমাকে।"

এ পর্য্যন্ত আশুতোষ সুরবালার হস্তে একটি পয়সাও দেন নাই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই টাকা চাহিতেন। ভবতারণ পশ্চিমে যাইবার সময়ে সুরবালাকে কিছু টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, তদ্দারা তিনি আশুতোষের আদেশ প্রতিপালন করিতেন। তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে; আশুতোষ মনে করিয়াছেন, বড়-মানুষের মেয়ে, কতই টাকা আছে; আজ কিন্তু টাকা নাই; আশুতোষ নাছোড়বান্দা।

সুরবালা বামার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।





দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।



রতের জননীর কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। ভবতারণ পীড়িত। তিন চারি দিনের পীড়াতেই গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে। টেলিগ্রাফে খবর পাইয়া সুরবালা যাইয়া মাতার দেখা পাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্যামাচরণ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে পঁহুছিতে পারেন নাই। গৃহিণীর পীড়া হইলেই শরৎ, সুরবালা ও শ্যামাচরণ, তিন জনকেই টেলিগ্রাফি করা হয়, কিন্তু শরৎ এ পর্য্যন্ত যান নাই। শ্যামাচরণ কাশীতে পঁহুছিয়াই তাহাকে পুনরায় টেলিগ্রাফ করিলেন, "ভাই! মা গিয়াছেন; বাবারও সময় হইয়াছে, শীঘ্র আইস।"

শরৎ তারের খবরটি হাতে করিয়া অসিয়া রূপবতীকে কহিলেন, "ওগো; দাদা আবার টেলিগ্রাফ করেছেন, বাবা এখন তখন, যেতে হচ্ছে কাশীতে একবার?

রূ। তা যাবে বইকি?

শ। না গেলে লোকে কি বলবে ?

রু। আর এতে লোকে বলবে না। এখানে মাও ত এখন তখন।

শ। তুমি আছ, মামা আছেন।

রু। সেখানেও ত তোমার ভাই আছেন, বোন্ আছেন, খুড়া আছেন, খুড়ী আছেন।

শ। তা ত আছেন, শ্রাদ্ধের সময়ে ত যেতেই হবে।

রু। কেন ? শ্রাদ্ধ কি আর এখানে হয় না ? তোমাদের দেশের লোকে গঙ্গাতীরে এসে শ্রাদ্ধ করে, তুমিও তাই করবে।

শ। তাও কি হয়, একবার না গেলে চলে কি ?

রু। চলে নিশ্চয়ই ; তবে তোমার মন—আমার মা মলেই তোমার কি, থাকলেই তোমার কি ? মার যদি আজ পেটের ছেলে থাকত, সে কিছুতেই ফেলে যেতে পারত না। এদিশি জামাই হলে সেও বুঝ্‌ত। সেখানে অতগুলি লোক রয়েছে, আর এখানে কেহই নাই।

শ। বল্লে বটে এতগুলি কথা, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, আমার মা মরেছেন, আর বাপের এখন তখন, এখানে ইনি ত এখনও কিছু দিন বাঁচতে পারেন।

রু। তোমার ইচ্ছা কি মা আজই মরেন ?

শ। তা কি আমি বল্‌ছি।

রু। ভাবটা তাই ; সাধে কি বলি, এর চাইতে কোলকাতার মুটে মজুরের সঙ্গে বে হলেও ছিল ভাল, তার সঙ্গে

মনের মিল হত। পাড়াগেঁয়ে তোমরা, তোমাদের সঙ্গে কিছু-তেই আমাদের মিল থায় না।

এ বক্তৃতার পর শরতের মুখে আর বাক্য সরিল না, তিনি অনেকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় চিন্তা করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা যাব ত না, কি বলা যায় দাদাকে বল দেখি?"

রূপবতীর নিকট এমন বিষয়ে পরামর্শ লইতে গেলে তাহার বুদ্ধি খুব ঘুরিত। তিনি অল্পক্ষণেই কহিলেন, "কেন, লিখে দাও সাহেবদের কাছে ছুটি চেয়ে কিছুতেই পেলেম না, তাই আমি এখানেই গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ করিব ঠিক করেছি।"

শরৎ এই যুক্তিই অবলম্বন করিলেন, এবং পরদিন অগ্রজকে লিখিয়া দিলেন, ছুটি না পাওয়ায় তিনি কাশীতে যাইতে পারি-লেন না।

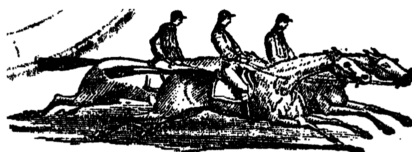
শ্যামাচরণ যে দিন এই চিঠি পাইলেন, ভবতারণের সেই দিনই মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেকবার তিনি, "শরৎ আসি-য়াছে? শরৎ আসিয়াছে?" বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ একবার উত্তর দিলেন, সে ছুটি পায় নাই। বৃদ্ধ কহি-লেন, "না হয় চাকরী ছাড়িয়াই দিত।" ভবতারণের চক্ষু দিয়া দু' ফোটা জল পড়িতে দেখা গেল। শরতের ব্যবহারে এ পর্য্যন্ত কোন দিন তিনি চক্ষুর জল ফেলেন নাই, আজি তাহা পড়িল।

শরৎ! মাতার অশ্রুপাত তোমার কার্য্যে অনেক হইয়াছে আজ পিতারও হইল। এমন উদারস্বভাব স্নেহময় পিতার এক,

বিন্দু নেত্রনীরে তোমার জীবনের সমস্ত সৎকর্ম্ম ভাসিয়া যাইবে না কি ?

শ্যামাচরণ যথাসময়ে জননীর ও জনকের শ্রাদ্ধ করিলেন। প্রেমচাঁদ, প্রেমচাঁদের স্ত্রী এবং সুরবালা, ইঁহারা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বাঁকুড়া হইতে বিদায় লইয়া জামাতা আশুতোষ আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধের পর আশুতোষ স্ত্রীকে লইয়া বাঁকুড়ায় ফিরিয়া গেলেন। শ্যামাচরণ অনেক অনুরোধ করিয়া পিতৃব্য এবং পিতৃব্যপত্নীকে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। শ্যামাচরণের ইচ্ছা ছিল, কলিকাতায় শরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। কিন্তু প্রেমচাঁদ তাঁহাকে সে কথা মুখে আনিতেও দিলেন না।





ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ



সুরবালা মাতার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে কাশীতে গিয়াছিলেন. সুতরাং মাতা পিতা উভয়েরই অন্তিম সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সুরবালার জননী কন্যাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। সন্তান মাত্রই পিতা মাতার স্নেহের জিনিস। সুরবালার ন্যায় কন্যার আদর হইবে না কেন? সুরবালা মাতার মৃত্যুর যে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে পঁহুছিয়াছিলেন, সে সমস্ত সময় টুকুই তিনি জননীর শুশ্রূষায় ব্যাপৃত ছিলেন। গৃহিণীও যে কয়েকটি কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সুরবালার সম্বন্ধেই কহিয়াছিলেন। সুরবালা আসিয়া মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিলেই গৃহিণী তাহার হাত দুখানি লইয়া একটি চুম্বন দিলেন, এবং "মা আমার, লক্ষ্মী আমার, এসেছ ?" বলিয়া তাহাকে আদর করিলেন ; ইহার

পরে দুই একটি যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করিয়াই শয্যাপার্শ্বো-পবিষ্ট ভবতারণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ওগো! শ্যামাচরণকে বলিও, আমার সুরিকে যেন কিছু দেয়।"

ভ। তা বল্‌তে হবে না। শ্যামাচরণের যে মন, তুমি না বল্লেও সে দেবে। শরৎ যে এমন ব্যবহার কচ্ছে, তাকেও শ্যামাচরণ মন্দ দেখে না।

গৃ। শরৎকে মন্দ দেখুক আর ভাল দেখুক, তাতে আমার কি?

গৃহিণী মুখ বিকৃত করিলেন।

ক্ষণকাল পরে পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "সুরবালা আমার গরীব, অমন মেয়ে কি হয়! ওকে যেন একটা বাড়ী ক'রে দেয়; ওর কাকাও ওকে যে ভালবাসে, সেও ওকে কিছু দিতে পারে। আমার মুক্তার মালাছড়াটা আমি ওকে দিলাম।"

সুরবালা কাঁদিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, "মা চুপ কর।"

ভবতারণ তাঁহাকে কহিলেন. "বাবা বিশ্বেশ্বরকে ডাক।"

গৃহিণী সুরবালার চক্ষে জল দেখিয়াই হাত তুলিলেন, এবং কন্যার অশ্রু মুছাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। হাত কিন্তু ততদূর গেল না, সুরবালা মুখ নত করিলেন, এবং মায়ের হাত ধরিলেন।

গৃহিণী কহিলেন, "কাঁদিস্ নে মা।"

সু। তোমার মত মা হারিয়ে কাঁদবো না!

গৃ। আমি কি করেছি তোদের মা? শরৎ বড় কষ্টটা দিয়েছে।

সু। মা, তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর মা। ছোড়্দার মতিভ্রম ঘটেছে মা। তুমি যদি সেঁপে যাও মা, তার জীবনই বৃথা হবে।

গৃ। সঁাপ দিব না, কিন্তু প্রাণে যে আশীর্ব্বাদ আসে না।

সু। সন্তানের অপরাধ নিও না মা।

সুরবালা জননীর পদধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন।

জননী পুনঃপুনঃ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহার পরে দু, চারিটি কথা হইয়াছিল মাত্র। ক্রমে জননী যতই মৃত্যুর নিকট-বর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন, কন্যা ততই তাঁহার মাতৃস্থানীয়া হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে বাহির করিবার সময়েও সুরবালা কোলে করিয়া তুলিয়া আনিলেন। গৃহিণী যেন মাতার ক্রোড়ে নিদ্রিতা বালিকার ন্যায় রহিলেন।

জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ কাশীতে পঁহুছিলেন; এবং মাতার সৎকার করিলেন। মাতাকে জীবিত দেখিতে না পাইয়া শ্যামাচরণ বালকের ন্যায় কাঁদিয়াছিলেন। ভবতারণ এবং সুরবালা, উভয়ে তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন।

গৃহিণীর মৃত্যুর পর ভবতারণের শরীর ক্রমশই খারাপ হইতে লাগিল। তিনি যেন গৃহিণীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এবং তাঁহাকে অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া নিজে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন। যে কয়েক দিন তিন বাঁচিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে শ্যামাচরণ এবং সুরবালাকে প্রায়ই উপদেশ দিতেন। এক দিন তিনি সুরবালাকে কহিলেন, "মা! স্বামীকে ভক্তি করিও।

স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাহাতেই সমস্ত যাগ যজ্ঞের ফল হয়। আশুতোষের চরিত্রে দোষ আছে শুনিয়াছি; এত দিন তোমাকে বলি নাই তোমার মনে কষ্ট হইবে বলিয়া, উহাতে মনে কখনও তাঁহাকে অভক্তি করিও না। ঐ তোমার দেবতা; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হইবে, তোমার কষ্টের শেষ হইবে।”

সুরবালা কথা কহিলেন না।

শরৎ! তুমি যদি আসিতে, হয় ত ‘তোমার স্ত্রীর চরিত্র সংশোধিত হইবে’, পিতার এমন আশীর্ব্বাদ তুমিও পাইতে!

ভবতারণ, সুরবালা সম্বন্ধে গৃহিণীর শেষ অনুরোধ, কন্যার অসাক্ষাতে, এক দিন শ্যামাচরণকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।





চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।



আশুতোষ কার্য্য-পরিদর্শনার্থ মফঃস্বল যাইবেন। বেলা ৯ টার সময় কন্ট্রাক্টার কেশব বাবু গাড়ী লইয়া আশুতোষের দরজায় উপস্থিত। মফঃস্বলে সাধারণতঃ কন্ট্রাক্টার বলিলে যে শ্রেণীর লোক বুঝায়, কেশব বাবু সে শ্রেণীর উপরে। আশুতোষ ইহার পূর্ব্বেও দুই এক বার কেশব বাবুর গাড়ীতে মফঃস্বল গিয়াছেন। সুরবালা শুনিয়াছেন, কেশব বাবু অতি ভদ্রলোক এবং উচ্চবংশের সন্তান। স্বামীর জন্য তিনি অনেক লোকের সম্বন্ধে সংবাদ কুড়াইতেন। যাঁহাদের চরিত্র নির্দ্দোষ শুনিতেন, স্বামীকে তাঁহাদের কাছে যাইতে দেখিলে অথবা তাহাদের সঙ্গে দিতে পারিলে, তিনি সুখী এবং নিশ্চিন্ত হইতেন।

আশুতোষ আহার করিতে বসিয়াছেন, কেশব বাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এই সময়ে সুরবালা বাহিরের

ঘরের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বামাকে দিয়া বলাইতে লাগিলেন, "আমার যেরূপ অবস্থা, আপনারা সকলেই দেখিতেছেন। আপনাদের সকলের অনুগ্রহেই আমি বাঁকুড়ায় আছি। উনি আপনার সঙ্গে যাইতেছেন, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বাসায় ফিরিয়া আসিতে পারেন, আপনি ইহাই দেখিবেন। অতি অল্প সময়েই উনি জ্ঞান হারাইয়া যান। দু, এক সময়ে এমন অপ্রকৃতিস্থ হন যে, তখন কেহ না কাছে থাকিলে অনায়াসে উঁহার প্রাণ যাইতে পারে। আপনি উহাঁকে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন শুনিয়াছি। আমি আর অধিক কি বলিব ?"

কেশব বাবু বামাকে দিয়া বলাইলেন, "ওঁকে নিশ্চিন্ত থাকৃতে বলুন, আমি আশুবাবুকে বাসায় ফিরাইয়া রেখে যাব।"

সুরবালার সরল কথাগুলি কেশবের প্রাণে লাগিয়াছিল। তিনি মনে মনে যেমন সুরবালার প্রশংসা করিতেছিলেন, তেমনি আশুতোষকে ধিক্কার দিতেছিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই আশুতোষ বাহিরে আসিলেন, এবং গাড়ীতে উঠিয়া কেশব বাবুর সহিত সোণামুখী রওনা হইলেন। পথে কেশব বাবু আশুতোষকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক উপদেশ দিলেন। আশুতোষ অল্পমাত্র কথা কহিলেন। আশুতোষের গুণ এই ছিল যে, প্রকৃতিস্থ থাকিলে তিনি অন্যের সহিত বড়ই ভালমানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি কেশব বাবুর কথার কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা সোণামুখী পঁহুছিলেন। সোণামুখীতে সরকারী

কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার নিমিত্ত একটি পাকা বাড়ী আছে। সাবেক নিয়মের সরকোটের জজেরা এখানে আসিয়া কাছারি করিতেন বলিয়া ইহাকে সর্কোটহাউস বলে। কেশব বাবুর বাটী সোণামুখীতে। আশুতোষ সর্কোটহাউসে থাকিবেন, ইহা পূর্ব্বেই স্থির ছিল। সেখানে যাইয়া দেখেন, বিষ্ণুপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তথায় আছেন। পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার দাবি অগ্রগণ্য, সুতরাং আশুতোষের তথায় থাকিতে বাধা ছিল না; ডেপুটি বাবু আশুতোষকে বাড়ীর অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিলেন। তিনি তাঁহাকে রাত্রিতে তাঁহার সঙ্গে আহারের নিমন্ত্রণও করিলেন। কেশব বাবু আশুতোষকে তথায় রাখিয়া যাইবার সময়ে, গোপনে কহিয়া গেলেন, "দেখিবেন ডেপুটি বাবুর সাক্ষাতে কোন অন্যায় আচরণ করিবেন না।" আশুতোষ 'না' বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

কেশব চলিয়া যাইবার পরেই আশুতোষ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন। রাত্রি ৮ টার সময় কেশব তথায় আসিয়া তাঁহাকে পাইলেন না। দেখেন, ডেপুটি বাবু আশুতোষের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। কেশব তাঁহাকে আহার করিতে বলিয়া আশুর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। আশুতোষের সোণামুখীতে গম্য স্থান যে সমস্ত, তথায় যাইয়া কেশব বিফল-মনোরথ হইলেন। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় এক স্থানে এক মেয়ে যাত্রার দলের গান হইতেছিল। কেশব ফিরিয়া আসিবার সময়ে একবার তথায় প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, তাঁহার মক্কেল সেখানে

বীভৎস কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন। গান প্রায় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

আশুতোষ, এই তোমার শিক্ষার ফল !

সোণামুখীর অধিকাংশ লোকই আশুতোষকে চিনিত। নচেৎ তিনি সেখানে যেরূপ ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রহৃত হইয়া অতি শীঘ্র বিদায় হইতে হইত। আশু-তোষ সরকারী কর্ম্মচারী, অনেক বার সোণামুখী গিয়াছেন। তাঁহার আচরণ দেখিয়া লোকে হাসিতেছিল মাত্র।

কেশব আশুতোষকে উঠাইলেন, এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাঙ্গালায় আনিলেন।

তথায় ডেপুটিবাবু আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলেন। কেশব এবং আশুতোষের পদশব্দ পাইয়াই তিনি জাগরিত হইলেন। আশুতোষ পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিহেন, "ডেপুটি বাবু যেন কিছু টের না পান।" কেশব তাহাকে লইয়া খাদ্যের সম্মুখে বসা-ইলেন। আশুতোষ দু, একবার কিছু মুখে দিয়াই বমন করিতে লাগিলেন। কেশব তাহাকে অতি কষ্টে শয্যায় শয়ান করাই-লেন। তিনি চলিয়া আসিবার সময়ে ডেপুটী বাবু তাঁহাকে ডাকাইলেন, এবং আশুর সম্বন্ধে দু,এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, কহিলেন, "কোনরূপে উহাকে বাঁকুড়ায় পঁহুছাইয়া দিতে পারিলে আমি রক্ষা পাই। বিধাতার কেমন বিধান জানি না, এই পশুর সহিত তিনি স্বর্গের এক সুরবালার মিলন করিয়া দিয়াছেন। স্বামীর প্রতি

তাঁহার অচলা ভক্তি। অল্প দিন হইল, তিনি বাঁকুড়ায় আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রশংসা না করেন এমন লোকই নাই। আমি তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি যে, আশুবাবুকে নিরাপদে বাসায় ফিরাইয়া রাখিয়া আসিব। সেই জন্যেই এত চিন্তা। থাকুক উঁহার কাজ; কালই আমি ওঁকে বাঁকুড়ায় রাখিয়া আসি।"





পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

র্ব অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, পাঠক তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছেন, আশুতোষ কেমন ভাবে এবং কত দ্রুতগতিতে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুরবালা এমন স্বামীকে লইয়া যে কষ্টে সংসার করিতেছিলেন, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার বিষয় নহে। সাধ্বী রমণী সকল সময়েই স্বামীর মঙ্গল চিন্তা করিতেন। আশুতোষের স্বভাব কিসে সংশোধিত হইবে, তাহারই উপায় ভাবিতেন। তিনি প্রকৃতিস্থ থাকিলে তাঁহাকে প্রায়ই চরিত্রের মূল্য, মদ্যের অনিষ্টকারিতা প্রভৃতি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন।

এত চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু আশুতোষের স্বভাবে কোন পরিবর্ত্তন হইল না। স্ত্রীর আগমনের পর হইতেই বরং আশু-

তোষের ঔদ্ধত্য, কদাচার প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতেছিল। আশুতোষ মনে করিয়াছিলেন, সঙ্গীরা না ভাবে যে, স্ত্রীর আগমনে আমি কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে আশুতোষ কাহাকেও কখনও প্রহার করেন নাই। এখন মাতাল অবস্থায় সুরবালার প্রতি প্রায়ই তাঁহার হস্ত পদাদির ক্রিয়া হইয়া থাকে। পতিপ্রাণা রমণী নীরবে তাহা সহ্য করেন। সুরবালা সাধ্যমত আশুতোষের ইচ্ছার বা মতের খণ্ডন করিতেন না। তথাচ তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার যথেষ্ট হইত। একান্ত অসহ্য হইলে সুরবালা কাঁদিতেন, এবং মনের কষ্ট ঈশ্বরসমীপে জ্ঞাপন করিতেন। ভগবানের অপার করুণায় তাঁহার বিশ্বাস যেমন সরল, তেমনই অটল ছিল। তিনি দয়া করিলে স্বামীর স্বভাব সংশোধিত হইবে. এ সম্বন্ধে সুরবালার বিশ্বাস কোনও দিনও স্খলিত হয় নাই। আশুতোষের মঙ্গলার্থ তাঁহার সাধ্য যাহা কিছু, তিনি সকলই করিতেন; কিন্তু সকল সময়েই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ছিল। আশুতোষ মফঃস্বলে গেলে সুরবালার প্রায়ই নিদ্রা হইত না। বামা প্রভৃতি বাসার সকলে নিদ্রিত হইলে সুরবালা সাশ্রুনয়নে কায়মনোবাক্যে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতেন, জগদীশ! কতদিনে এ হতভাগিনীর প্রতি তোমার দয়া হইবে? কি কষ্টে আমার দিন যাইতেছে, একবার চাহিয়া দেখ। তোমার কৃপায় সাবিত্রী, শমনের হস্ত হইতে মৃত স্বামীকে ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন, তোমার দয়া হইলে আমি কি মদের হস্ত হইতে আমার জীবিত পতিকে উদ্ধার করিতে পারি

না? সুরবালার প্রার্থনার প্রত্যেক কথা অন্তর হইতে বাহির হইত, কিন্তু মুখে অনেকগুলি ফুটিত না। যতক্ষণ তিনি প্রার্থনা করিতেন, ততক্ষণই কাঁদিতেন। এমন সরলবিশ্বাস-প্রণোদিত প্রার্থনা নিষ্ফল হইবার নহে।

সুরবালা প্রথমতঃ মানুষের সাহায্য, সহানুভূতি অধিক পান নাই। সংসারে কয়জন লোক পরের ভাবনা ভাবিতে প্রস্তুত? অন্যকে অধঃপাতে যাইতে দেখিলে অনেকেই বরং মনে মনে একরূপ কদর্য্য প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন। কেহ কেহ পতনের সাহায্য করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। দুই চারি জন অবশ্য এমন আছেন, যাঁহারা পরের অধোগতি দেখিলে ব্যথিত হন, কিন্তু সর্ব্বদা আপনার লইয়াই ব্যস্ত বলিয়া সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে পারেন না। কেবলমাত্র দু একটী দৈবস্বভাব মনুষ্যই পরের জন্য খাটিয়া থাকেন। বাঁকুড়ার সমাজেও এমন লোক ছিলেন না, তাহা নহে। ভবনাথ শিবরতনের সংখ্যা অধিক হইলেও, সেখানে ভাল লোক এক জনও ছিলেন না, এমন নহে। সুরবালার আগমন হইতেই তাঁহার প্রতি এক দলের বিরক্তি হইতেছিল। যাঁহাদের স্বভাব ভাল, পরের অধঃপতন দেখিতে যাঁহারা ভাল বাসেন না, তাঁহারা কিন্তু আশুর প্রতিই বিরক্ত হইতেছিলেন। সুরবালার চরিত্রই ইঁহাদের অনেকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভবনাথ, শিবরতনের প্রতি অনেকেই চটিয়া গেলেন। যাহাতে এমন স্ত্রীকে এই পশু আর নির্য্যাতন করিতে না পারে, তজ্জন্য

তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন। অনেকেই বলিতে লাগিলেন, আশুতোষের স্ত্রীর ন্যায় রমণী দুর্লভ। সে তাহার স্বামীর স্বভাব সংশোধনের জন্য এত চেষ্টা করিতেছে, আমরা যদি তাহার সাহায্য না করি, তাহা হইলে আমরা মনুষ্য নহি। যে তাহার পথের কণ্টক হইবে, তাহার ন্যায় নরাধম আর নাই। সুর-বালার প্রতি সাধারণের এই সহানুভূতি ঈশ্বরপ্রেরিত, সন্দেহ নাই। পাঠক পূর্ব্বেই আভাস পাইয়াছেন, সুরবালা একদিন রামদয়াল বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন। তদবধি তিনি মধ্যে মধ্যে রামদয়াল বাবুর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নিমন্ত্রণের দিন সহরের অধিকাংশ ভদ্রলোকের পরিবারেরা একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, এবং সুরবালাকে দেখিয়াছিলেন। অবরোধবাসিনী রমণীগণ এক স্থানে মিলিতে পারিলে প্রায়ই হাস্য কৌতুক আদি করিয়া থাকেন। সুরবালা একে নূতন, তাহাতে আবার স্বামীর স্বভাব ভাবিয়া, ইহাতে যোগদান করেন নাই। তিনি অতি দীনভাবে এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। রমণীগণ ইহাতেই, কিন্তু, তাঁহার সম্বন্ধে অতি অনুকূল ধারণা করিয়াছিলেন। ইহার উপর রামদয়াল বাবুর স্ত্রীর মুখে তাঁহার সুখ্যাতি! সুরবালা অন্য কাহারও বাড়ীতে যান নাই। কিন্তু রামদয়াল বাবুর বাড়ীতে অনেকেই আসিতেন। রামদয়াল বাবু অনেক কাল বাঁকুড়ায় কর্ম্ম করেন। তিনি প্রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার গৃহিণীও বর্ষীয়সী। ইঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই দেবপ্রকৃতির লোক ছিলেন। সুরবালা রামদয়ালের স্ত্রীকে

মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। রামদয়াল বাবু এবং তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে কন্যার ন্যায় দেখিতেন।

রামদয়াল কোন দিনই আশুর গর্হিত আচরণ উপেক্ষা করেন নাই; কিন্তু সুরবালার সরলতা, স্বামিভক্তি এবং সৎস্বভাব দেখিয়া, তিনি আশুর স্বভাব সংশোধনের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তিনি আশুর প্রতি অতিশয় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। রামদয়াল আশুর উপরিস্থ কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহার তাড়না বা অনুযোগ অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে। আশুতোষ জানিতেন, রামদয়াল অনায়াসেই তাঁহার চাকরি লইয়া টানাটানি করিতে পারেন।

রামদয়ালের তাড়নার ফলে অচিরে আশুর আচরণের পরিবর্ত্তন ঘটিল। স্ত্রীর আগমনের পর হইতে তিনি যে দুর্দ্দাম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এখন তাহা অনেকটা প্রশমিত হইল। সহরে কোন গোলযোগ করিতে আশুতোষ এখন অনেকটা ভয় পান। রামদয়ালের চক্ষের অন্তরাল হইলে কিন্তু তাঁহার ততটা ভয় থাকে না। ফলতঃ, এখন তিনি তাঁহার কুব্যবহার অনেকটা লুকাইতে চান।



ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।



শরতের শাশুড়ীর কাল হইয়াছে। শ্রাদ্ধোপলক্ষে শরতকে কিছু ধার করিতে হইয়াছে। শরত যাহা বেতন পান, তদ্দ্বারা কলিকাতার বাসার খরচ এবং রূপবতীর ফরমাস কুলানই দুঃসাধ্য। শ্রাদ্ধের কিছু দিন পরে এক দিন, স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছে।

শ। এ আমি কিছুতেই পারিব না।

রূ। না পার্‌লে নেই নেই, আমি যা বল্‌ব, তা ত তুমি পার্‌বেই না।

শ। সব কথাই ত শুনি, যা বল্‌ছ তাই কচ্চি।

রূ। বল্‌চি কি তোমার ভালর জন্যে, না আমার ভালর জন্যে?

শ। আমার ভালর জন্যেই হক, লোকে কি বল্‌বে?

রু। লোকের বলাবলিতে ত সব আস্‌ছে যাচ্চে।

শ। বল যে, আমি কি কোন দিন কিছু চেয়েছি? হাঁ, এমন হ'ত, চেয়ে কিছু পাই নাই—তা হলে তোমার কথা শুনতাম।

রু। চাইবে কি? তাঁদের আক্কেল নাই?

শ। তাঁরা কি জানেন আমার অভাব হ'য়েছে, কি কষ্ট হ'য়েছে, আচ্ছা এক বার চেয়ে দেখি।

রু। চাইবে কি, ভিক্ষে ক'চ্ছ না কি? তোমার কি একটা অংশ নাই?

শ। অংশ থাকলেও আমি ত কখনও কিছু চাই নাই, অথবা বাড়ীতেও যাই নাই।

রু। বাড়ীতে যাবে কেন? সকলেই কি এক যায়গায় থাকে? তোমার যা আছে এনে যদি তুমি এখানে বসে খাও?

শ। তা ত আর তাদের বলি নি—তারা কি হাত গণে জান্‌বে?

রু। তোমার সঙ্গে কথা কওয়া আর একলা জঙ্গলে বসে ঝগড়া করা একই—ঝকমারি আমার যে, গায়ে পড়ে আবার তোমার মত স্বামীর সঙ্গে কথা কইতে যাই।

শ। স্বামীর অপরাধ?

রু। অপরাধ আমার আর আমার অদৃষ্টের! বলিছি ত যে কোন কালেই তোমাদের সঙ্গে আমাদের মনের মিল হবে না।

শ। আমি ত সব কথাই শুনি। কখনও তোমার কথা অগ্রাহ্য করেছি?

রু। অগ্রাহ্য ক'রবে কেন? আমি আমার ভালর জন্যেই বলি কি না? যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে কি আর একশ টাকায় চলে?

শ। চলে না তা ত আমিও বুঝি।

রু। তবে—দু দিন অসুখ ক'রে পড়ে থাক্‌লে উপায় কি হবে? শরীর ত মানুষের।

শ। চলে যাবেই এক রকমে।

রু। আর রকম কি বল—তাই কি আমায় ভারী দুখানা গয়না দিয়েছ যে, তাই দিয়ে কিছু দিন চালাবে? লোকে শ্বশুরবাড়ীতে কত গয়না পায়—তা তোমাদের দেশে ভারী গয়নার রেওয়াজই নাই।

শ। থাক্‌লেই বা কি হবে? কবেই বা গেলে শ্বশুরবাড়ী আর কবেই বা তারা দেবে?

রু। দেবার হ'লে এখানে দিতে পারেন, এখানে আছি ব'লে ত আর সম্পর্ক ধুয়ে যায়নি—তার বেলায় ঢন্ ঢন্। যেমন পয়সা শুন্‌তে পাই তোমাদের—এ দেশে হলে বউএর মুখ দেখ্‌ত দু হাজার টাকার মুক্তার মালা দিয়ে।

শ। তুমি একবার চল দেশে, আমি তোমায় দু তিন খানা গয়না করে দেব।

র। কাজ নাই আমার, অমন দেশে যাবার চাইতে কলিকাতার রাস্তায় ভিক্ষে করে খাই সেও ভাল।

শ। তবে আর বল কেন?

র। বলি আমার গ্রহ—গ্রহ নইলে আর এত রাজ্যি থাকৃতে বেছে বেছে তোমার সঙ্গে বে হবে কেন? মাসীমার তিন মেয়ে,—তিনটেই কল্‌কেতায় পড়েছে—আমার কি বে হ'ত না এখানে? সাত জন্মের অধর্ম্মের ফল, তাই তোমার সঙ্গে বে হ'ল।

শ। তা বলে আর কি হবে? এখন ত আর উপায় নাই, এখন এতেই যাতে এক রকম চলে, তাই ভাব।

র। তুমি যদি আমার কথা শুন্‌তে, আমার বুদ্ধিমত চল্‌তে, তা হলে আমার কষ্ট কি?

শ। দেখ? আর কি কর্‌তে হবে, সবই ত করেছি—বিবাহের পর এমন স্নেহময় পিতা মাতার সঙ্গে এক দিনের জন্ম সদ্ব্যবহার করি নাই; মরিবার সময় একবার দেখা করিলাম না। অমন গুণের ভাই, এক দিন তাঁহার নাম মুখে আনি না। দেশের কথা ভুলে গিয়েছি। আর কি কর্ত্তে হবে, জানি না। যা বল্‌ছ, তাই শুন্‌ছি।

র। এ কি সব আমার জন্যে—যাও, তুমি আজই দেশে যাও, আমার কপালে আজও যা, কালও তা; তুমি থেকেও যা, না থেকেও তা। আমি মরি ওঁর জন্যে, আর উনি মরেন কার জন্যে, তাই।

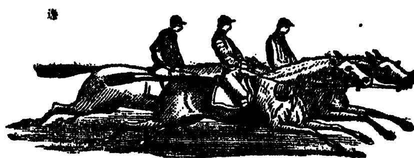
শ। আচ্ছা, যা তুমি বল্‌ছ—এ কি মানুষে পারে ?

রূ। মানুষে পারে না তবে কি গরুতে পারে ?

শ। আমি ভাবি ওর চাইতে ভিক্ষে করে খাওয়া ভাল।

রূ। তাই আছে তোমার কপালে, আমি বোঝালে সোজালে হবে কি ? বলে—'মা মরেন ঝিএর জন্যে, ঝি মরেন কার জন্যে'—তাই।

রূপবতীর মুখে এইরূপ প্রবাহ ছুটিতেছিল, এমন সময়ে বাহির হইতে একটি ভদ্রলোক "শরৎ বাবু! শরৎ বাবু" বলিয়া ডাকিলেন ;—"যাই, কে ডাক্‌ছে" বলিয়া শরৎ সেই বক্তৃতা-তরঙ্গোদ্বেলিত অন্দর-প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন।





সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।



শরৎ আদালতে। তিনি তাঁহার পৈতৃক বিষয়ের অংশ পাইবার নিমিত্ত অগ্রজ শ্যামাচরণের নামে নালিস করিয়াছেন। রূপবতী শিখাইয়া দিয়াছেন, এরূপ করিলে সহজেই কিছু টাকা আদায় হইবে। জেলার সবজজ আদালতে মোকদ্দমা। বাজিতপুরের ঘোষপরিবার জেলার সকলেরই সুপরিচিত। শরৎ প্রথমতঃ তাঁহার মোকদ্দমার জন্য উকিল খুঁজিয়া পান নাই। যাহার কাছে যান সেই তাঁহাকে বলে এ নিয়ে মোকদ্দমা করা কেন? আপনি আপনার দাদা এবং খুড়াকে বুঝাইয়া বলুন, তাহারা আপনার অংশ আপোষে ছাড়িয়া দিবেন। শরতের এ কথা ভাল লাগিল না। যতক্ষণ রূপবতীর মন্ত্র তাঁহার কানে না ধরিয়াছিল, ততক্ষণ এরূপ কথা তিনি

নিজেই বলিয়াছিলেন ; কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন আর নয়। অল্প চেষ্টার ফলেই শরৎ একজন নূতন উকিল পাইলেন,—চারি বৎসরের মধ্যে তাহার আঠার জেলা ঘোরা হইয়াছে। সম্প্রতি একটি মুনসেফির জন্য বিফল চেষ্টা হইতেছে। শরৎ কলিকাতা হইতে আরজী লেখাইয়া আনিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত উকিল তাহা দাখিল করিলেন। মোকদ্দমার ইস্থ ধার্য্য অর্থাৎ বিচার্য্য বিষয় নির্দ্ধারণের দিনেই কাছারি গৃহে লোকারণ্য। পুরাতন উকিল সকলেই প্রায় শ্যামাচরণের পক্ষে। শরৎ একাকী, তাঁহার উকিল একাকী। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রথম উকিল তারিণী বাবু বলিলেন, "এ মোকদ্দমা চলিতে দেওয়া উচিত নহে। বাজিৎপুরের ঘোষ মহাশয়েরা এ প্রদেশে বিশেষ সম্মানিত। আদালত অনুগ্রহ করিয়া কিছু সময় দিলে আমি এই মোকদ্দমাটা মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করি।" আদালতের ইহাতে আপত্তি ছিল না। তিন দিনের অবকাশ প্রদত্ত হইল। তারিণী বাবু বাহিরে যাইয়াই শরৎকে ডাকাইলেন। শরৎ বলিয়া পাঠাইলেন, "তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, কিন্তু শ্যামাচরণ কিম্বা প্রেমচাঁদ থাকিলে তথায় যাইবেন না।" তারিণী বাবু ইহাতেই সম্মত হইলেন, এবং শরৎকে বলিয়া পাঠাইলেন, প্রেমচাঁদ বা শ্যামাচরণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। শরৎ আসিলে বুদ্ধিমান বৃদ্ধ উকিল তাঁহার সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়াই বুঝিতে পারিলেন, কিছু টাকা পাইলেই শরৎ মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যান।

বিষয়ের অংশ লইয়া বাজিৎপুরে বাস করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। কি পরিমাণ অর্থ পাইলে শরতের তুষ্টি হইতে পারে, ইহা বুঝিতেও বাকি রহিল না। তারিণী বাবু শরৎকে বিদায় দিয়াই প্রেমচাঁদ এবং শ্যামাচরণকে ডাকাইলেন, এবং শরতের মনোগত ভাব তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিলেন। শ্যামাচরণ কহিলেন, "বাড়ী আস্‌তে চায় না; তা ত বরাবর জানি। তা কিছু টাকা চায় ত নিক্।" প্রেমচাঁদ রুক্ষ স্বরে কহিলেন, "টাকা নেবে? এক পয়সাও না। যে ব্যাটা বাপের শ্রাদ্ধ করিল না, সে আবার টাকা নেবে? অমন কুলাঙ্গারের মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়! মোকদ্দমা অমনি ছেড়ে দিয়ে যায় ত যা'ক। দেবোত্তর সম্পত্তি! ভাগ নিতে এসেছেন কল্‌কেতা থেকে? থাক্ গে শ্বশুরের বিষয়।"

প্রেমচাঁদের ভাব দেখিয়া তারিণী বাবু শ্যামাচরণকে লইয়া কিঞ্চিদ্দূরে উঠিয়া গেলেন, এবং কিয়ৎকাল সেখানে যাইয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে প্রেমচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

তারিণী বাবু উত্তর করিলেন, "ওকে পাঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে দিন।"

প্রে। পাঁচিশ হাজার! পাঁচিশ টাকাও নহে।

শ্যামাচরণ প্রেমচাঁদকে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন, "যা'কৃগে, কি হবে—ও বাড়ীতে থাক্‌লে ত কতই নিতে পারত।"

প্রেমচাঁদ বলিলেন, "বাড়ীতে এসে এখনও নিক্ না। কে

ওকে বাধা দেয়? ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম নাই, মা বাপের সঙ্গে সংস্রব নাই, বিষয় নিতে এসেছেন তাদের।”

তারিণী বাবু তাঁহাকে কহিলেন, “দেখুন, মোকদ্দমায় কি হয় বলা যায় না। আমাদের দেশের একটি বড় লোক খৃষ্টান হয়েও তার বাপের বিষয় পেয়েছিল। কাজ কি মোকদ্দমা ক’রে? আপনাদের বংশের ছেলে ত বটে—ও যদি কষ্ট পায়—”

প্রে। ও ত কষ্ট পাবেই। টাকা দিলেও দেখ্‌বেন আপনি ওঁর কিছু লাভ হবে না। মানুষ হলে ও কি নালিশ করে? চাইলে টাকা পায় না? যা’ক্‌, আমি আর কার জন্যে টানাটানি করি? আমার থাক্‌লেও ত ওদেরই। শ্যামাচরণের যখন ইচ্ছে হ’য়েছে, তখন দিয়ে দিন্‌। টাকাগুলি কিন্তু জলে যাবে—” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রেমচাঁদ চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর দিনই শরৎকে ২৫ হাজার টাকা গণিয়া দেওয়া হইল। মোকদ্দমা চুকিয়া গেল। প্রেমচাঁদ শ্যামাচরণ বাড়ী গেলেন। শরৎ টাকা লইয়া কলিকাতামুখে ছুটিলেন।





অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।



শরৎ টাকা লইয়া কলিকাতা পৌঁছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, রূপবতী বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিবেন; কিন্তু টাকার পরিমাণে তাহা হইল না। রূপবতী এ পর্য্যন্ত শরতের কোন কাজেই অমিশ্র সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। আজি করিবেন কেন? তিনি কহিলেন, "একটু মোড় দিলেই বেশী বাহির হইত। আমি আর তোমাকে কত শেখাব? গাধা পিটে ঘোড়া করা যায়, কিন্তু মানুষ করা অসম্ভব।" শরতের ভাগ্যে এইরূপ সম্ভাষণই প্রায় ঘটিত, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবগত আছেন।

শরৎ ফিরিয়া আসিবায় দুই দিন পরেই রবিবারের দিন মধ্যাহ্নে শরৎ এবং রূপবতীতে কথোপকথন হইতেছে।

ব্র। কি ঠিক ক'ল্লে ?

শ। কি আর কর্'ব ? তুমিই ত বরাবর ব'লেছ, বেশী গোছ কিছু টাকা আন্‌তে পার্‌লে কোম্পানির কাগজ ক'রে রাখ্‌লেই একটা জোর থাক্‌বে। এখন বল্‌ছ উল্‌টো !

ব্র। তোমার টাকা তুমি যা ইচ্ছা তাই কর। আমার বলাতে আস্‌ছে যাচ্ছে কি ?

শ। কোন্ কাজটা তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে করি।

ব্র। তা ক'র্‌লে এত দিনে মানুষ হ'য়ে যেতে।

শ। যা'ক, টাকাটা মামাকেই দেওয়া যা'ক।

ব্র। দিলে তোমারই লাভ। কোম্পানির কাগজে সুদ পাবে শতকরা সাড়ে চারি টাকা। মামা বল্‌চেন্, ছ টাকা ক'রে তোমাকে দিয়ে যদি কিছু লাভ কর্ত্তে পারেন, তাই তাঁর।

শ। তা ত বুঝি, কারবারে বড় ঝঞ্ঝাট।

ব্র। ঝঞ্ঝাট ত আর তোমাকে পোহাতে হবে না।

শ। তা বল্‌ছিনে, হ'লে ভালও হ'তে পারে, না হ'লে সবই যেতে পারে।

ব্র। তাই বল, মামার উপর তোমার বিশ্বাস নাই—এত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবার দরকার কি ?

শ। সব কথাই যে বাঁকা ক'রে নাও।

ব্র। বাঁকা করি যে কাজে। যাই কর, ঢেঁকুর ছাড় না। ইচ্ছে হয়, দাও মামাকে, না হয় না দাও। ভারী ত টাকা।

মামার বাবা বেঁচে থাকলে মামা তোমার মতন লোকের খোষামোদ কর্ত্তে যাবেন কেন? কপাল মামার!

শ। মামার বাবার যা কিছু প্রায় মামাই খুইয়েছেন!

রূ। কাজ নাই তোমার টাকা দিয়ে, কাজ নাই তোমার অত কথায়। মামার কি সে স্বভাব এখন কিছু দেখতে পাও? এই জন্যেই লোকে বলে আপনার আর পর।

রূপবতী এই কথার পরে, প্রায় আড়াই গজ পরিমাণে একটি কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন, এবং পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "আর বুকও চাই একটু। পাড়াগেঁয়ে লোক, হাজার লেখাপড়া শিখুক, সহরের লোকের মত বুক হবে না। এনেছ ক'টি টাকা; এর ভেবেই পাচ্ছ না যে, কি করবে তা দিয়ে।"

শ। তা ত বল্‌ছি ও যায় যাবে, নিন্ মামা—কারবার করুন্।

রূ। যাবে কেন? মামা যেমন বল্লেন, যাবার কোন কথাই নাই। বরং বাড়্‌বে। তোমাকে ছ' টাকা ক'রে ত দেবেনই, ক্রমে বেশী লাভ হ'লে বেশীও দিতে পারেন।

শ। বেশী আর চাইনে। মামা যা বলেছেন, তাই দিলেই হ'ল, আর যখন টাকাটা চাই, তখন পেলেই হ'ল।

রূ। তা পাবে বই কি।

শ। তবে ব'লো, মামা এলে টাকা নিতে।

রূ। সব কিছু এক দিনে দরকার হবে না। যেমন দরকার

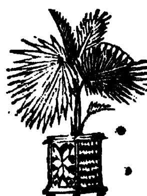
হবে, তেমনই নেবেন। তুমি কা'ল খানকত বড় নোট ভাঙ্গিয়ে খুচরা নোট ক'রে এনে দিও।

শ। তা দেব।

বলা বাহুল্য, টাকা মামার খাতায় জমা হইয়া রূপবতীর সিন্ধুকেই রহিল।

শরৎ যখন মোকদ্দমা লইয়া ব্যস্ত, সেই সময়ে মামা রূপবতীর রক্ষকস্বরূপ কলিকাতার বাসায় ছিলেন, এবং তখনই যে মামা ভাগিনেয়ীর মধ্যে কারবারের পরামর্শ হইয়াছিল, ইহা আর বলিয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি?

এই ঘটনার পরে কিছু কাল পর্য্যন্ত রূপবতী এবং তিনকড়ি শরতের প্রতি বড়ই সদ্ব্যবহার করিতেন। রূপবতী তাঁহাকে কোন অপ্রীতিকর বাক্য প্রায়ই বলিতেন না। মামার হাতে অর্থরাশি ছাড়িয়া দেওয়াতেই যে শরতের প্রতি এই অযাচিত অনুগ্রহবৃষ্টি হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।





ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।



জ এক বৎসর হইয়া গিয়াছে, মামা শরতের টাকা লইয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাকে একটি পয়সাও দেন নাই। মামা যে ভাবে কারবার চালাইতেছিলেন, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিত যে, অর্থ না বাড়িয়া ক্ষয়ের দিকে যাইতেছিল। শরতের মনেও এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। শরৎ ভবতারণ ঘোষের সন্তান। বাজিৎপুরের ঘোষ পরিবারের দান ছিল, কিন্তু অপব্যয় বা নিরর্থক ব্যয় ছিল না। একটি পয়সা অন্যায় ব্যয় হইলেও ভবতারণ তাহাতে কষ্ট বোধ করিতেন। আমরা জানি, একদিন এক গোয়ালা তাঁহাদের বাড়ীতে খানিকটা ঘৃত বিক্রয় করিয়াছিল। হিসাব করিয়া তাহার দাম তিন টাকা পনের আনা তিন পয়সা হইল। সরকার গোয়ালাকে চারিটি

টাকা দিয়া কহিল, "একটি পয়সা দাও।" ভবতারণ সম্মুখে ছিলেন। গোয়ালা কহিল, "আমার কাছে পয়সা নাই, একটা পয়সায় আর কি হবে?" সরকার ভবতারণের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তিনি কহিলেন, "একটা টাকা ফেরত লইয়া ভাঙ্গাইয়া উহাকে পয়সা দাও।" গোয়ালা হাসিয়া কহিল, "মহারাজ, কত লোকে কত খায়, একটা পয়সার জন্যে আমার টাকাটা ভাঙ্গা যায়।" ভবতারণ বলিলেন, "নাহে বাপু, এ জিনিসের দাম; তোমার যা হিসাবে পাওনা, তাই পাবে।" গোয়ালাকে ঠিক পয়সাই লইতে হইল। এই ভবতারণের রক্তই শরতে ছিল, সুতরাং পঁচিশ হাজার টাকা জলে যাইবে, ইহা তিনি সহ্য করিবেন কিরূপে? শরৎ এক দিন মামার কারবারের স্থল দেখিতে গেলেন, এবং হিসাব পত্র পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। মামা বলিলেন, "হিসাব ঠিক করি, তার পর দেখ্‌বে।" শরৎ ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতেই শরতের সংসারে আগুন লাগিল।

সন্ধ্যার পর শরৎ বসিয়া আছেন, রূপবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তুমি মামার হিসাব দেখতে গেছ্‌লে?

শ। হাঁ।

রূ। তখনই বলেছিলাম, তোমার ও টাকা মামাকে না দেওয়াই ভাল ছিল। অমন সন্দিগ্ধ মন—

শ। সন্দিগ্ধ মন আর কি? দেখতে গেলাম্ কারবারে কিছু হচ্ছে কি না?

রু। তোমার তা দেখ্‌তে যাবার দরকার? কারবার কচ্চেন মামা। তোমার সুদ পেলেই হল।

শ। তাও ত ঢের পেয়েছি—বছর ঘুরে গেছে, একটি পয়সাও ঘরে আসে নি।

রু। কাজ নেই বাবু! কালই মামাকে বল্‌ছি তোমার টাকা ফিরিয়ে দিতে। যা ইচ্ছে তোমার, তাই কর টাকা দিয়ে।

শ। সব কথাতেই চটো!

রু। চটি কি সাধে?

শ। সাধে নয় ত কি? মামার যে বুদ্ধিশুদ্ধি, ওঁর অংশীদারেরাই ওঁকে ঠকাবে। আমাকে দেখ্‌লে তাদের একটু ভয় থাক্‌বার কথা।

রু। তা ত বটেই—মামার বুদ্ধি নেই, তোমার আছে।

শ। যাক্, আমি আর কিছু বলবই না। ধ'ল্লাম ও টাকাগুলি জলে গেছে। তোমার পরামর্শেই ভাইএর নামে নালিশ ক'রে টাকা আনা, তা তোমার বুদ্ধিতেই গেল।

রু। যাবে কেন? কোন্ গোলামের বেটী, যদি আমি তোমার টাকা না আনিয়ে দি—দেখি মামা যদি কিছু খুইয়ে থাকেন, তবে আমার গয়না আর বাড়ী বেচে দেব;—বাড়ীখানা ত আমার। নফর, নফর, মামাকে ডাক ত। বোধ হয় মাণিক ভট্টাচার্য্যের টোলে তাস খেল্‌তে গেছেন।

নফর চাকরের নাম। রূপবতীকে অতিশয় গরম দেখিয়া শরৎ একটু নরম হইলেন। কিন্তু তাহাতেই নিস্তার কই? রূপবতী এইবার নাকিসুরে আরম্ভ করিলেন, "সাধে কি বলি, এর চাইতে কলকাতার এক মুটে মজুরের সঙ্গে বে হ'লেও ছিল ভাল। তার সঙ্গেও মনের মিল হত। এ মনের অন্ত পাওয়া ভার।"

কিসে কি হয় কে বলিতে পারে? এই কয়েকটী কথাতেই শরৎ কেমন চটিয়া গেলেন। পল্লীগ্রামের ভাব সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে প্রকাশিত হইল—তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সে তোমারই;—এতদিন যে ভাবে আমি তোমার সেবা করেছি—মা বাপকে ভুলে তোমার মনস্তুষ্টি কর্ত্তে চেষ্টা করেছি—এ ভাবে ঈশ্বর আরাধনা কল্লে এতদিনে আমার মুক্তি হ'য়ে যেত। আর কোন * *র ভজনা কল্লেও, বোধ হয়, তার মন পেতাম, কিন্তু তোমার পেলেম না। বে হওয়া অবধি শুনছি, এর চাইতে মুটে মজুরের সঙ্গে বে হ'লেও ছিল ভাল। মুটে মজুরের চৌদ্দপুরুষ এলেও তোমার মন পেত না।"

রূ। বটে, * *র ভজনা কল্লেও তার মন পেতে।

ইহার পর আর কথা হইল না। রূপবতী শরতে বাক্যব্যয় বন্ধ হইল।



ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।



যে দিন রূপবতীর সহিত মামার কারবার লইয়া শরতের কলহ হয়, সে দিন শনিবার ছিল। ইহার পরবর্ত্তী চারি পাঁচ দিনের মধ্যে রূপবতী এবং মামাতে গোপনে প্রায়ই কথোপকথন চলিত। বৃহস্পতি বারের দিন শরৎ আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রূপবতী বাসায় নাই; মামাও নাই; ঝিও নাই। বামুন আসিবার তথনও সময় হয় নাই। সে মধ্যাহ্নে রাঁধিয়া চলিয়া যায়, আবার সন্ধ্যার সময়ে আইসে। শরৎ শূন্য ভবনের কিছুই অর্থ করিতে পারিলেন না। তিনি যখন বাটীতে প্রবেশ করেন, তখন বাহিরের সদর দরজা খোলা ছিল। কিন্তু বাহিরের ঘরের পার্শ্বে যে দরজা দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। বাহিরের ঘরের দরজায়

তালা ছিল। কিন্তু বাড়ীতে লোক থাকিলেও অনেক সময়ে সে তালা বন্ধ থাকিত, এবং তাহার চাবিও এমন একটি যায়গায় থাকিত; তাহা বাড়ীর সমস্ত লোকই জানিত। বাহিরের ঘরের ভিতর দিয়া অবশ্যই অন্দর-মহলে প্রবেশ করা যাইত। শরৎ তাহাই করিলেন, এবং বাড়ীর ভিতরে সমস্তই শূন্য দেখিলেন। শরৎ অপ্রস্তুতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে একমাত্র ভৃত্য নফর বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল; শরৎ তাহাকে দেখিয়াই কহিলেন, "এরা সব কোথায় রে?"

ন। আজ্ঞে তা ত জানি না। আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কম্বুলেটোলায় পদ্মলোচন বাবুর বাড়ীতে।

শরৎ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। উপরের ঘরে যাইয়া দেখেন, বাক্স পেটারা ইত্যাদি যাহা কিছু ছিল, প্রায়ই নাই। শরতের নিজের কাপড় চোপড় যে তোরঙ্গটিতে থাকিত, এবং যাহার চাবি তাঁহার নিকটে, কেবল সেইটি আছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, বাসনপত্রের অধিকাংশও রূপবতীর সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে।

শরতের বা রূপবতীর এক বৎসর বয়সের একটি পুত্র ছিল; সে অবশ্যই সঙ্গে গিয়াছে।

শরৎ কোন মতে প্রবাসীর ন্যায় সেই বাসায় রাত্রি যাপন করিলেন। সমস্ত রাত্রি প্রায় তাঁহার নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই আর এক বিড়ম্বনা।

একটি লোক আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিল।

শরৎ বাহিরে গেলেই সে কহিল, "এ বাড়ীটি আমার মনিবের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। আপনি ভাড়া দিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলে থাকিতে পারেন, নচেৎ উঠিয়া যাইতে হইবে।"

শরৎ জানিতেন, বাড়ীটি রূপবতীর নামেই বটে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বিক্রয় করিয়াছে?"

আগন্তুক উত্তর করিল, "বাড়ীর মালিক্, প্রিয়নাথ বাবুর কন্যা।"

শ। দলিল আছে?

আ। আজ্ঞে হাঁ, দলিল আছে। পরশু দলিল রেজেষ্টারি হইয়াছে।

এখন আর শরতের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র এবং মামা, রীতিমত পটল তুলিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, তাহা অবশ্য জানা নাই, কিন্তু তাঁহারা যে কলিকাতা হইতে অনেক দূরে গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। শরৎ ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। আত্মগ্লানি তাঁহার যথেষ্ট হইল। এই স্ত্রীর জন্য তিনি অনেক করিয়াছেন। শৈশব হইতে যাঁহাদের সহিত সম্পর্ক, এবং যাঁহাদের নিকটে কিয়ৎপরিমাণে তিনি ঋণীও বটেন, এমন পিতা মাতাকে ভুলিয়া তিনি কলিকাতায় বসবাস করিয়াছেন। বিবাহের পর দু' চারি দিনের জন্য ভিন্ন কখনও রূপবতীকে ছাড়িয়া অন্য স্থানে যান নাই। কিন্তু রূপবতী তাঁহাকে কিছু না বলিয়া সামান্য অপরাধের জন্য চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষ পরিবারের পঁচিশ হাজার টাকা গেল। সেদিন

তিনি অগ্রজ এবং পিতৃব্যের নামে নালিশ করিয়া ঐ টাকা আনিয়াছেন। কলিকাতায় যে দাঁড়াইবার স্থানটি ছিল, তাহাও বিক্রীত। রূপবতীর অনুসন্ধান করিব, এমন সঙ্কল্প শরতের মনে আসিল না। রূপবতী শরৎ-নেবুকে চট্‌কাইয়া প্রায় তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি শরতের প্রীতিও কমিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু রূপবতী তাঁহাকে ফেলিয়া পলাইবে, শরতের মনে এমন ধারণা হয় নাই। তাই স্ত্রীর এরূপ আচরণে শরৎ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। একবার তাঁহার এমনও মনে হইল, জীবনের এ অধ্যায় এখানেই শেষ। এখন বাড়ী ফিরিয়া যাই। দাদা কি কাকা আমাকে "দূর হইয়া যাও" এমন কথা বলিবেন না। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। বাড়ী যাইয়া কেমন করিয়া মুখ দেখাইব? শরৎ স্থির করিলেন, কলিকাতাতেই থাকিব। চাকরি করিব, আর খাইব। যাহা বাঁচাইতে পারি, সৎকার্য্যে ব্যয় করিব। সংসারে সঙ্গী আর খুঁজিব না। এ বাড়ী বিক্রীত হওয়ায় ভালই হইয়াছে। এখানে থাকিলে আমার পাগল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অল্পপয়সায় একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে থাকিব।

ইহার পরদিনই শরৎ অন্য পল্লীতে এক ক্ষুদ্র বাড়ীতে বাসা লইলেন। রূপবতীর বাড়ী ক্রেতার হস্তে গেল।



একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।



পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রামদয়াল বাবুর তাড়নায় এবং যত্নে আশুতোষের চরিত্রে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আশুতোষের কুব্যবহারের মাত্রা এবং পরিমাণ অনেক কমিয়াছে। তিনি ক্রমশই তাঁহার স্ত্রীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন। এমন না হওয়াই অস্বাভাবিক। আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিব, তোমার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিব, তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে না? জগতে এমন দৃশ্য বিরল। পাঠক জানেন, আশুতোষের স্বভাব বিকৃত হওয়াতেই তিনি স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেন। এখন তিনি অনেক সময়ে অন্যের নিকটে সুরবালার প্রশংসা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে সুরবালার কথা শুনিলে তাঁহার কাণ জ্বলিয়া যাইত। এখন আর তেমন হয় না। আশুতোষ এক দিন মফঃস্বলে যাইবার সময়ে গাড়ীতে কণ্ট্রাক্টর

কেশব বাবুকে বলিতেছেন, "যা'ই বলি মহাশয়, এমন বুদ্ধি আমার স্ত্রীর, দুটো একটা কথা ব'ল্‌লেই আপনি অবাক্ হবেন!"

কেশব সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বটে, আপনার বুদ্ধি এমন দাঁড়িয়েছে!"

আ। বুদ্ধি চিরদিনই ছিল, তবে সময়ে সময়ে লোপ পায়। একদিন আমি ব'ল্লুছি যে, 'রামদয়াল বাবু প্রভৃতি যেমন আরম্ভ ক'রেছেন, এখন আমি পা'র্‌লে মদটা ছেড়েই দি!' তাশুনে বল্‌ছে কি—'পারবে না কেন? ইচ্ছে হ'লেই পার।' আমি বল্লেম 'ইচ্ছে ত করি, হ'য়ে উঠে না। কেমন একটু স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়, কাজকর্ম্ম ক'র্ত্তে, সেটা আর একটু পেটে না পড়্‌লে হয় না।' মশায়, এই কথার জবাবে ব'ল্লে কি যে, "ভেবে দেখ দেখি, পৃথিবীর বার আনা লোকে মদ খায় না, তা'রাও ত কাজকর্ম্ম করে, বিনা মদেই স্ফূর্ত্তি পায়! ইচ্ছা ক'রে এত লোকের কাছে হীনতা স্বীকার কর কেন?' আমি তা'র মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে রইলেম। লেখাপড়া খুব বেশী শিখেছে, তা নয়। যাও শিখেছে, তাও ঘরে। কিন্তু এম্‌নি সুন্দর কথাটা ব'ল্লে!

কেশব বাবু এই কথাটি শুনিয়া অনেকক্ষণ আশুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—শেষে কহিলেন, "এমন স্ত্রী অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না, কিন্তু আপনি তা'র উপর প্রায় পশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন!"

আ। আমি তা'র তুলনায় পশু, এ অম্লানবদনে স্বীকার ক'র্ত্তে পারি!

আশুর স্বভাবে এই পরিবর্ত্তন দুই এক দিনে হয় নাই। সংসারে ইহা সমস্ত বিষয়ে সত্য যে, কিছু ভাঙ্গিতে গেলে যে সময় লাগে, নূতন গড়িতে গেলে, তদপেক্ষা অনেক অধিক সময়ের প্রয়োজন। মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে ইহা খাটিবে না কেন? আশুতোষ এখনও মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করেন, এবং আত্ম-বিস্মৃত হন। কিন্তু ভাল অবস্থায় তিনি শত্রু-মিত্র চিনিতে পারেন; এইমাত্র পরিবর্ত্তনেই তিন চারি বৎসর সময় লাগিয়াছে।

আশুতোষের চরিত্রে এই পরিবর্ত্তনদর্শনে সুরবালা সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ কি? কিন্তু ইহার কিছু দিন পরেই আশুতোষ পীড়িত হইলেন। তাঁহার শরীর কোন দিনই রীতিমত সুস্থ ছিল না। এত অত্যাচারে তাহা থাকিবারও কথা নহে। আশুতোষ বাতে শয্যাশায়ী হইলেন। অনেক দিন হইতেই তাঁহার রক্ত দূষিত হইয়াছিল, এখন তিনি প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত হইলেন। সুরবালার যত্নের ত্রুটি নাই। তিনি অহর্নিশ স্বামীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত। কিন্তু ডাক্তার, কবিরাজ, যে দেখিল, সেই বলিল, "দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা না করিলে, আশুতোষের আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।" অনেকের পরামর্শ হইল, তাঁহাকে পশ্চিমে কোনও স্থানে লইয়া যাইয়া কিছুকাল বাস করা। সুরবালা তাহারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এই পীড়াতে আশুতোষের অন্তঃকরণে অনুতাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। তিনি বুঝিলেন, রোগ তাঁহার অহিতাচারের জন্য

খরচের বাকির হিসাবমাত্র। রোগযন্ত্রণা যত বাড়িতে লাগিল, স্বাস্থ্য ততই তাঁহার নিকট অমূল্য বোধ হইতে লাগিল। কবে তিনি কাউপারের কবিতায় পড়িয়াছেন, 'যে লোক ইচ্ছা করিয়া আপনার জীবন বা স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তাহার ন্যায় পাপী আর নাই।' এখন সেই কথা প্রতিমুহূর্ত্তেই আশুতোষের মনে জাগিতে লাগিল। আশুতোষ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, একবার সুস্থ হইতে পারিলে, আর কুপথে যাইব না। বিপদে পড়িলে, এমন প্রতিজ্ঞা অনেকেরই মনে আসিয়া থাকে। দুর্ব্বল মানব, বিপদ চলিয়া গেলেই, আবার অনায়াসে তাহা লঙ্ঘনও করে।

পূর্ব্বে সমস্ত অত্যাচার সহ্য হইয়াছে বলিয়া শরীরের প্রতি তিনি সমুচিত যত্ন করেন নাই; এখন তিনি সময়ে সময়ে শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতেন। এক দিন কেশববাবু আশুকে দেখিতে আসিয়াছেন। সেই সময়ে আশুতোষের একটি সুস্থকায় ভৃত্য ভার স্কন্ধে লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। আশুতোষ তাহাকে দেখাইয়া কেশবকে কহিলেন, "দেখুন, মনে হয়, ঐ লোকটার স্বাস্থ্য আমায় দিক্, আমি উহাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়া উহার কাজ করি!"

আশুতোষের মনে পূর্ব্বে এক দিনও হয় ত এমন চিন্তা আসে নাই। উপরে বলা হইয়াছে, আশুতোষের পীড়ায় জীবনের আশঙ্কা না থাকিলেও ভুগিবার সম্ভাবনা বিলক্ষণ ছিল। সকলের পরামর্শানুসারে সুরবালা তাঁহাকে লইয়া পশ্চিমে গেলেন।



দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।



আশুতোষ ও সুরবালা কাশীতে। স্ত্রীর যত্নে এবং চিকিৎসকের চিকিৎসার গুণে, আশুতোষ পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। সুরবালার প্রতি এখন আশুতোষের ভালবাসা জন্মিয়াছে। যে ভাবে তিনি স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াছেন, আশুতোষের জননী জীবিত থাকিলেও, তাহা অপেক্ষা অধিক করিতে পারিতেন না! ব্যারাম হওয়া পর্য্যন্ত আশুতোষ অর্দ্ধেক বেতনে বিদায়ে আছেন। ব্যয় কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। ঔষধের মূল্য, কাশীর বাড়ীভাড়া, ইত্যাদিতে অল্প পড়িতেছে না। সুরবালা সংসার চালাইতেছেন। আশুতোষকে এক দিনের জন্য অর্থের চিন্তা করিতে হয় নাই।

আশুতোষের শরীর কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিলেই, বাঁকুড়ায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব হইল। যে দিন তাঁহারা কাশী ত্যাগ করিবেন, তৎপূর্ব্বদিন সকাল বেলায় সুরবালা গঙ্গাস্নান করিয়া

ফিরিবার সময়ে, চারি বৎসরের একটি বালক সঙ্গে করিয়া গৃহে আসিলেন। আশুতোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওটি কে?"

সু। একটি ছেলে।

আ। তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি,—কার ছেলে?

সু। তা জানি না। রাস্তায় কুড়িয়ে পেলেম।

আ। কুড়িয়ে পেলে কেমন?

সু। দুই মাগী, কথাবার্ত্তা কচ্ছিল। ছেলেটা সেখানে দাড়িয়ে। বুঝলেম এই যে, তাদের এক জনের বাড়ীতে এই ছেলেটা আর ওর মা, ভাড়াটে ছিল। একটা মিন্সেও সঙ্গে ছিল। সে আর ওর মা টা বসন্ত হ'য়ে মরেছে। ছেলেটার আর কেউ নাই। সে মাগী, ওকে বিলিয়ে দেবার জন্য খুঁজ্‌ছিল।

আ। কি জেতের ছেলে?

সু। ব'ল্লে ত ভাল কায়েতের ছেলে। মা টা হয় ত খারাপ ছিল; ঐ ছেলেকে নিয়েই ঘর বাড়ী ফেলে পালিয়ে এসেছিল।

আ। খুব সম্ভব। দেখ্‌লেই ভদ্রলোকের ছেলে ব'লে বোধ হয়।

সু। ভদ্রলোকের ছেলে তা'তে সন্দেহ নাই।

আ। যে ভালবাস তুমি ছেলেপুলে, মন্দ হল না!

সু। আমার চেয়ে বামার আগ্রহ বেশী। সে বলে 'নিজের পেটে ত আর ছেলেপুলে হবে না! পরের একটা নিয়েই মনের আক্ষেপ মিটাও!' আহা! বাড়ীওয়ালী মাগী যেন ছেলেটাকে ফেলে দিতে পাল্লে বাঁচে।

আ। মেয়ে হ'লে হয় ত রাখ্‌ত!

আশুতোষ একটু হাসিলেন। তাঁহার এ মন্তব্যে, সুরবালাও একটু হাসিলেন। স্বামীর সহিত কথোপকথনে, তাঁহার মুখে হাসি, বোধ হয়, এই প্রথম বাহির হইল।

তিন চারি দিনের মধ্যেই আশুতোষ বাঁকুড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। সুরবালা সর্ব্বপ্রথমে যাইয়া রামদয়াল বাবুর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আশুতোষ এখন মানুষের মত হইয়াছেন শুনিয়া, তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

ইহার কয়েক দিন পরেই, আশুতোষ দেশ হইতে বিপিনের এক চিঠি পাইলেন,—তাঁহার স্ত্রী সরোজিনী পীড়িত। একটি শিশু কন্যা লইয়া বিপিন ব্যতিব্যস্ত আছেন। সংবাদ পাইয়া সুরবালা যাইতে চাহিলেন। বামা তাঁহার সঙ্গে গেল। আশুতোষ কিছু দিনের জন্য বাঁকুড়ার বাসায় একাকী রহিলেন।

সুরবালা বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, স্ত্রীর শুশ্রূষা করিতে করিতে বিপিনেরও শরীর ভাঙ্গিয়াছে। সুরবালা প্রাণপণে উভয়েরই শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। গ্রামে যে বৈদ্য ছিলেন, তিনিই চিকিৎসা করিতেছিলেন। কয়েক দিন পরে সরোজিনীর পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া উঠিল। সুরবালা বাড়ী আসিবার পর, পনের দিনের দিন, তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। বিপিন তাঁহার শিশু কন্যাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। সরোজিনীর পিতৃকুলে, নিকট আত্মীয় এমন কেহ ছিলেন না,

যিনি কন্যাটির ভার লইতে পারেন। সুরবালা প্রস্তাব করিলেন, কন্যাটি তাঁহার সঙ্গে যাইবে।

বিপিন সুরবালার স্বভাব জানিতেন। তাঁহার নিকটে থাকিলে, কন্যাটি বিশেষ যত্নে থাকিবে, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি অতি সহজে সম্মত হইলেন।

সুরবালা বাঁকুড়ায় ফিরিয়া আসিলে, আশুতোষ উপহাস করিয়া কহিলেন, "যাক্, বিনা ক্লেশেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে, পাওয়া গেল।" কাশীতে যে ছেলেটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, তাহার নাম অজয়। সুরবালা, সরোজিনীর কন্যার নাম বিরাজ রাখিলেন।

আশুতোষ এখন সুরবালার বিনা অভিপ্রায়ে কোনও কার্য্যই করেন না। সুরবালার সংসারে সুখের ছায়া পড়িয়াছে। অজয় এবং বিরাজকে তিনি আপনার পুত্র কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। আর্থিক সচ্ছলতা তাঁহার বড় ছিল না। কিন্তু আশুতোষের অপব্যয় কমিয়া যাওয়ায়, তিনি যাহা আনিতেন, সুরবালার সুবন্দোবস্তে তাহাতেই বেশ চলিয়া যাইত। সহসা এক দিন কিন্তু আশুতোষের কিঞ্চিৎ অর্থের অভাব হইল, তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পরের অধ্যায়ে পাঠক ইহার বিবরণ জানিতে পারিবেন।



ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।



রোজিনীর মৃত্যুর পর, আশুতোষের বাড়ীর আর শ্রী রহিল না। বিপিন প্রায়ই বাড়ী আসিতেন না, সেই মহাজনের গদিতেই বাস করিতেন। দুই বাড়ীতে একটিমাত্র চাকর ছিল। সেও অধিকাংশ সময়ই এখানে সেখানে কাটাইত। তথাপি একরূপ চলিতেছিল, কিন্তু বৎসর না ঘুরিতেই বিপিনের কাল হইল। আশুতোষের কাছে সংবাদ গেল। এই সময়ে গ্রামের জমীদার খাজানার জন্য এক নালিশ করিলেন। আশুতোষ অনেক দিন খাজানা দেন নাই। বিপিনও তজ্জন্য বিশেষ তাগাদা করেন নাই। মোকদ্দমা ডিক্রী হইল আশুতোষের বিরুদ্ধে—পাওনা দেড় শত টাকা। ডিক্রীদার ঐ টাকার জন্য আশুতোষের ভদ্রাসন বাড়ীটি ক্রোক দিলেন। বাঙ্গালীর ভদ্রা-

সনের প্রতি মমতা বড়ই অধিক। আশুতোষ এই টাকার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তিনি জানেন, সুরবালার হাতে এত টাকা নাই। তাঁহার বন্ধু ভবনাথ ও শিবরতন বাবুর নিকট গেলেন।

ইহাদের দুই জনের কাছেই, আশুতোষকে বিফলমনোরথ হইতে হইল। তিনি নানাপ্রকারে বলিয়া দেখিলেন, এক এক জনের কাছে পঞ্চাশটি টাকা ধার চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা অতি মিষ্টস্বরে কহিলেন, "পঞ্চাশটা টাকার জন্য এত বলিতে হবে কেন? থাকিলে অবশ্যই দিতাম।"

খুঁজিলে, ইহাদের এক এক জনের পেটে, আশুতোষের দুই তিন শত টাকা পাওয়া যাইতে পারে!

আশুতোষ ভগ্নচিত্ত হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

সুরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেছ্‌লে?"

আশুতোষের এখন সুরবালার নিকট গোপন করিবার কিছুই নাই। তিনি সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

সুরবালা বলিলেন, "দেখি চেষ্টা ক'রে।"

আ। আর চেষ্টা কি? তোমার একখানা গহনা দিলে, বাজারে এক মহাজনের কাছে বন্ধক দিয়ে, টাকাটা আন্‌তে পারি।

সু। গয়না কি আছে?

আ। সে কি?

সু। আমার গয়না সবই বন্ধক।

আ। কা'র কাছে ?

সু। মার কাছে।

আ। রামদয়াল বাবুর স্ত্রীর কাছে ?

সু। হাঁ। পূর্ব্বে প্রায়ই তুমি মাঝে মাঝে টাকা চাইতে। তখন তোমার আবদার মিটাবার জন্যে দু'একখানা ক'রে বাঁধা দিতে হ'ত। শেষে কাশীতে যাবার সময়ে সবগুলি রেখে হাজার টাকা নিয়ে যাই।

আ। বটে! আমি জান্‌তেম, টাকা তোমারই কাছে ছিল। বালা দুগাছিমাত্র রেখেছ বুঝি ?

সু। তাও নয়। এ দুগাছি, কেমিক্যাল্ সোণার! হাত খালি থাক্‌বে ব'লে, ঐ রেখে দিয়েছি।

আ। তুমিই স্ত্রী! এতেই তুমি আমাকে নরক থেকে টেনে তুলেছ!

সু। আচ্ছা রেখে দাও—আমি তোমায় দেড়শ টাকা এনে দিতে পারি।

আ। কা'র কাছ থেকে ?

সু। ঐ মা'র কাছ থেকে। মা আমাকে মরবার সময়ে যে মুক্তার মালা ছড়া দিয়ে গেছ্‌লেন, তা আছে, সেইটি রেখে—

আ। কাজ নেই। আমার চেন্, আঙ্গটী, কি শাল বাঁধা দিয়ে আমি টাকা আন্‌ব!

সু। ছি! দেশশুদ্ধ লোকে জান্‌বে।

আ। তা জানুক; তুমি যে এত ধার ক'রেছ, শুধ্‌বে কোত্থেকে?

সু। আমার একটু বিষয় আছে।

বাস্তবিকই ভবতারণের মৃত্যুর পর, শ্যামাচরণ, সুরবালার নামে একটি বিষয় রাখিয়াছিলেন। ইহাতে বৎসরে ছয় শত টাকা আয় হইত। শ্যামাচরণ এই আয়ের টাকাটি জমাইয়া পৃথক্ রাখিতেন, এবং কখনও কখনও কারবারে খাটাইতেন। তাহাতে যাহা বৃদ্ধি হইত, তাহাও সুরবালার থাকিত।

যে দিন সুরবালা মুক্তার মালা বাঁধা দিয়া টাকা আনিলেন, তৎপর দিনই শ্যামাচরণ তাঁহাকে এক চিঠি লিখিলেন, "তোমার তহবিলে তিন হাজার টাকা হইয়াছে। যদি বল, পাঠাইয়া দি। আমার ইচ্ছা, তুমি এবং আশু কিছুকাল আসিয়া এখানে থাক।"

সুরবালা টাকাটা পাঠাইতে লিখিলেন, এবং যাওয়া সম্বন্ধে আশুতোষের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। আশুতোষের নিজের মত এখন প্রায়ই ছিল না; তিনি বলিলেন, "তুমি যেতে বল, যাব।" আশুতোষ এখন সর্ব্বদাই মনে মনে ডি, এল্, রায়ের

"চিরজীবসুখিনী, বঙ্গরমণী, রমণীকুল প্রবরা রে"

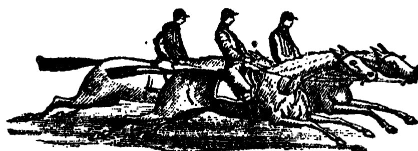
এই গানটি গাহিতেন।

সুরবালার সমস্ত দেনা শোধ হইল। রামদয়াল বাবুর স্ত্রী সুদ কিছুই লইলেন না। সুরবালা প্রণাম করিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কহিলেন, "বাছা, তোমার স্বামীর

সুগতি হ'য়েছে, ইহাতেই আমি পরম সন্তুষ্ট। তুমি সুখে থাক!''

আশুতোষ সস্ত্রীক বাজিৎপুরে আসিয়াছেন।

প্রেমচাঁদ এক দিন শ্যামাচরণের সহিত সুরবালা সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহার অংশের এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি তিনি তাঁহাকে দিবেন। বাকি দুই তৃতীয়াংশ, শ্যামাচরণের দুই পুত্র পাইবে। কেবল তাহাই নহে, সুরবালার বাসের নিমিত্ত, প্রেমচাঁদ তাঁহার বাড়ীর অধিকাংশ ছাড়িয়া দিলেন। আশুতোষের চাঁকরি করিবার আর প্রয়োজন রহিল না।



আট হাজারের আট পয়সাও, ও চুরি করে নাই। টাকাটা নিয়েছে সেই বিষ্ণু বোস। আফিসের সব লোকেই তাই বিশ্বাস করে। বিষ্ণু এখন পলাতক। তাঁকে ধ'রে, নেবেই বা কি? জামিন্ ত শরতের। হিসাবও তারই হাতে। তার গাফিলি না হ'লে আর টাকাটা যেতো না।

শ্যামাচরণের আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি রাস্তার উপরেই ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন; দেখিলেন, বক্তা কিম্বা গৃহস্বামীর উঠিতে বিলম্ব আছে। শ্যামাচরণ সেখানে উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, যে শরতের কথা বলিতেছিলেন, তাহার বাসাটা কোথা, বল্‌তে পারেন?"

ব। আপনি তা'কে জানেন কি?

শ্যা। আজ্ঞে হাঁ।

ব। বাসার নম্বরটা বল্‌তে পার্‌ব না, পল্লীটা জানি। আপনি আপিসে গেলেই তা'র দেখা পাবেন। আপিসের একটা দরওয়ান সঙ্গে সঙ্গে তা'র বাসায় যায়, আবার তা'কে নিয়ে ফিরে আসে। শ্যামাচরণ বুঝিলেন, শরৎ কয়েদী!

ইহার পর দিনই তিনি আপিসে যাইয়া উপস্থিত। শ্যামাচরণের কথায় আট দশ হাজার টাকার জামিন হইতে পারেন, কলিকাতায় এমন লোক দু' একটি ছিলেন। শ্যামাচরণ সেইরূপ একজন আইনজ্ঞ লোক সঙ্গে লইয়া আপিসের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শরতের দেনা দাঁড়াইল ৭৬৭৫৲ টাকা। শ্যামাচরণ, সাহেবের সহিত ৭০০০৲ টাকায় রফা করিলেন, এবং

ঐ টাকার জন্য, সঙ্গীয় সঙ্গতিপন্ন লোকটিকে জামিন দিলেন। তিনি কলিকাতায় পরিচিত, সাহেবের আপত্তি রহিল না।

শরৎ একটি কোণের ঘরে ছিলেন। অগ্রজের সহিত এ পর্য্যন্ত তাঁহার দেখা হয় নাই। শ্যামাচরণ সমস্ত কাজ চুকাইয়া, শরতের কাছে আসিলেন, এবং কহিলেন, "চল, বাড়ী চল!"

"দাদা"—বলিয়াই শরৎ কাঁদিয়া উঠিলেন।

শরৎ শ্যামাচরণকে বড় সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছিলেন। বুঝিতে বাকি রহিল না যে, শ্যামাচরণ তাঁহারই জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। শরৎ এত দিন অনুতাপ প্রকাশ করিবার অবসর পান নাই। আজ তাঁহার ক্রন্দন আর বন্ধ হইল না; কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "দাদা, তুমি এখানে এসেছ টাকা দিয়ে আমাকে বাঁচাতে? আমার মত পাষণ্ড ভাইএর কথা ভোল নাই? আমি কি তোমার ভাই? আমি কি তোমার পায়ের ধূলো ছোঁবার যোগ্য?" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শরৎ শ্যামাচরণের পায়ের উপর পড়িয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ অনেক কষ্টে তাঁহাকে চুপ করাইলেন। শরৎ পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "দাদা! আমার জন্যে এত টাকা নষ্ট ক'ল্লে? আমি কি মানুষ? যদিও আমি টাকা চুরি করি নাই, না দিলে হয় ত জেলই হ'ত! জেলই আমার জায়গা!" পুনরায় কাঁদিয়া উঠিলেন, "দাদা আমার জন্যে টাকা দিওনা—আমাকে বাঁচাইও না—আমি গলায় ছুরি দিব! সংসারে আমার স্থান নাই।" শ্যামাচরণ কোনমতে, গাড়ীতে তুলিয়া, শরৎকে বাসায় আনিলেন।



পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।



রৎকে বাজিৎপুরে আনা হইয়াছে। সে শরৎ আর নাই। শরতের মস্তিষ্ক বিকৃত। শ্যামাচরণ নানারূপ চিকিৎসা করাইতেছেন; কিন্তু শরতের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে না। শরৎ কাহারও প্রতি কোনও অত্যাচার করেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই বকেন। অনেক সময়েই তিনি অসম্বদ্ধ প্রলাপের ন্যায় কথা কহিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে তিনি যাহা বলেন, তাহা আত্মগ্লানি ও অনুতাপে পূর্ণ। অর্থ এই যে, তিনি পিতামাতার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। অনেক সময়ে তিনি মাতৃষোড়শীর শ্লোকগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে চীৎকার করেন,—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

কখনও কখনও আপনা-আপনি বকেন,—

"মুরলী বাবু, মুরলী বাবু, মা'র জন্যে পৃথিবীর ফল খাওয়া ছেড়ে দিলেন, মরণ সময়ে মাকে ফল দিতে পারেন নাই—। মা কমলালেবু খেতে চেয়েছিলেন, ডাক্তার বারণ ক'রেছিল, শেষে অবস্থা খারাপ দেখে, তীরস্থ করবার সময়ে, ডাক্তর যখন ব'ল্লেন, 'ইনি এখন যা খেতে চান, তাই দিতে পারেন।' তখন মুরলী বাবু নিজে কমলালেবু নিয়ে মাকে খেতে দিলেন, কিন্তু মার আর খাবার সময় ছিল না; লেবু খাওয়া হলো না। সেই থেকে মুরলী বাবু লেবু দেখ্‌লে ত কাঁদেনই, কিন্তু কোনও ফলই আর খান না। আরে মাতৃভক্তি! আর আমি, আমি মাকে দেখ্‌তেও গেলাম না!"

এক দিন অপরাহ্ণে শরৎ শুইয়া আছেন, এক জন চাকর তাঁহার মাথায় কবিরাজী তেল মাখাইয়া দিতেছে। লক্ষ্মী-রূপিণী ভ্রাতৃবধূ (শ্যামাচরণের স্ত্রী) শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন; শরৎ তাঁহাকে দেখিয়াই শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আপনি আমাকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছেন? কত পাপী আমি জানেন? এ সংসারের কত অনিষ্ট করেছি জানেন? এক রাক্ষসীর মায়ায় ভুলে গেছ্‌লাম! আপনি আমার মুখ দেখেন? এক সময়ে মনে মনে আপনাকেও হয় ত অবজ্ঞা

ক'রেছি! ও হো হো! আপনি মুখ দেখ্‌বেনই ত! আপনিই যে মা! মা ত গিয়েছেন, মা গেলেন আমারই জন্যে; এখন আপনিই মা! যদি আবার ভাল হই, একবার আপনার, আর দাদার সেবা ক'র্‌ব। তা'তেই কি পাপ যাবে? মনে করতেম, আপনি অশিক্ষিতা, সুরবালাও অশিক্ষিতা; আপনাদের যা শিক্ষা, তাই স্ত্রীলোকের শিক্ষা। আমাকে ক্ষমা করুন, দুটী পায়ের ধূলো দিন্‌; না আমাকে ছুঁলেও পাপ!" চাকরেরা শরৎকে শোয়াইল। শ্যামাচরণের স্ত্রী স্বয়ং দেবরের মাথায় তেল মাথাইতে লাগিলেন।

এ দৃশ্য দেখাইয়া আর ফল কি?

শরতের মাথা খারাপ রহিয়াই গেল। সময়ে সময়ে তাঁহার জ্ঞান হইত, সময়ে সময়ে তিনি ক্ষেপিতেন।

যে দিন তিনি সুরবালার পালিত পুত্র অজয়কে প্রথম দেখিতে পান, সেই দিন অতিশয় ক্ষেপিয়াছিলেন।

'অজয়' নাম শুনিয়া, তাঁহার প্রাণে জ্বালা হইয়াছিল। রূপবতীর পুত্রকে তিনি এই নামটি দিয়াছিলেন। তিনি অজয়কে নিকটে ডাকিলেন, এবং বালকের অঙ্গের দুই এক স্থান পরীক্ষা করিয়াই চেঁচাইতে লাগিলেন, "ওরে সুরি! ক'রেছিস্‌ কি? সেই ঝাড়ের কঞ্চি এ কুড়িয়ে বাড়ীতে আন্‌লি কোথা থেকে?"

শৈশবে অজয়ের অঙ্গে দুইটি কালো দাগ ছিল। শরৎ তাহা দেখিয়াই নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহাকে চিনিতে পারিলেন।

ইহার পর হইতেই তিনি আরম্ভ করিলেন, "তাড়াও ওকে বাড়ী থেকে—নইলে, বিপদ !"

দুই তিন দিন শরৎ আত্মহত্যার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকজন সতর্ক থাকায়, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

শরতের অবস্থা দেখিয়া, বাড়ীর সকলেই তাঁহার পূর্ব্বকৃত সমস্ত দোষ ভুলিয়া গেল। প্রেমচাঁদ পীড়িত। শরৎ বাড়ী আসা পর্য্যন্ত তিনি আর শয্যা হইতে উঠিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি মধ্যে মধ্যে শরতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং তাঁহার অবস্থা শুনিয়া চক্ষের জল ফেলিতেন।





উপসংহার

উপসংহার-অধ্যায় না লিখিলেও চলে।

অজয় শরতের পুত্র জানিতে পারিয়া, শ্যামাচরণ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তাহাকে আর বাড়ীতে আনা হইল না। শরৎ তাহাকে দেখিলেই ভয়ানক ক্ষেপিতেন; এজন্য যত দূর সাধ্য, অজয়কে তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে রাখা হইত। অজয় এখন সুরবালার বাড়ীতেই থাকে। সুরবালার শিক্ষায় বালকে মাতৃদোষ কিছুই লক্ষিত হয় নাই।

অজয় এবং বিরাজে বড় ভাব। সুরবালা কর্ত্তৃক তাহারা ঠিক ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় পালিত হইয়াছে। যখন অজয়ের বয়স ১৪ বৎসর, আর বিরাজের বয়স ১১ বৎসর, সেই সময়ে একদিন বিরাজের বিবাহের সম্বন্ধের কথা লইয়া এক ঘটক আসিয়াছে। ঘটকের সহিত আশুতোষের কথা হইতেছিল। বালিকা তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিতেছিল। ঘটকজী বর্ত্তমান প্রথানুসারে বরের

জন্য যাহা দাবি করিতেছিলেন, আশুতোষের নিকট তাহা কিছু অতিরিক্ত বোধ হইতেছিল। ঘটক তাহার দাবি সমর্থনার্থ, পুনঃপুনঃ বিরাজের পিতৃমাতৃহীনতার উল্লেখ করিতেছিলেন। বালিকার অন্তরে ইহাতে বড়ই লাগিল। সে এবং অজয় যে গৃহে পড়িত, বালিকা তথায় যাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সহসা অজয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বিরাজকে কাঁদিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"বিরাজ! কাঁদ কেন?"

বালিকা উত্তর করিল না।

অজয় ছাড়িবার নহে। বিরাজের চোক মুখ মুছাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদ কেন?"

বিরাজ এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার মা নাই, বাপ নাই—"

অ। মা কি তোমায় অযত্ন করেন?

বি। মা অযত্ন ক'র্‌লে কি আর এত বড় হ'তেম?

অজয় এবং বিরাজ উভয়েই সুরবালাকে মাতৃসম্বোধন করিত। ইহারা কেহই জানে না যে, ইহাদের কথোপকথন সুরবালা সমস্ত শুনিতেছিলেন। তিনি পার্শ্বের ঘরে একটা জিনিষ খুঁজিতে আসিয়া, জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতে পান; জানালাটি ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল। সুরবালা ইহাদের কথা শুনিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন।

অজয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন তোমার কান্না পেল কিসে?"

বিরাজ বলিল, "আমার বিয়ের ঘটক এসেছে। সে জানিতই খুঁজেছে যে, আমার মা নাই, বাপ নাই।"

অ। দেখ বিরাজ, আমারও মা নাই, বাপও ত [illegible] মধ্যে। বাপ আমায় দেখিলে ক্ষেপে উঠেন। তোমার আর আমার ত একই অবস্থা। আমি ত কাঁদি না। এই কথা বলিলাই কিন্তু অজয় কাঁদিল, এবং বিরাজের গলা ধরিয়া কহিল, "কেঁদো না।"

সুরবালা [illegible] দেখে মোহিত হইলেন। [illegible] আর অপেক্ষা করা অনাবশ্যক বোধে, তিনি চলিয়া গেলেন, এবং শীঘ্রই আশুতোষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তথায় আসিলে কহিলেন, "ঘটককে ডেকে আন।"

আ। কেন?

সু। অজয়ের সঙ্গে বিরাজের বে দেব।

আশুতোষ ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া রহিলেন, এবং পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মত কখন হ'ল?"

সুরবালা "এখনই হয়েছে" বলিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছিলেন, আশুতোষকে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "তা বেশ ঠিক করেছ।" ওদের মধ্যে ভালবাসা হবারই কথা—সম্পর্কও বাধে না।

ইহার পর অল্পদিনের মধ্যেই অজয় এবং বিরাজের [illegible] হইয়া গেল। শ্যামাচরণ দেখিলেন, ইহাতে যেন [illegible] পুত্র কন্যা একত্র হইল। অজয়ের জন্য কিছু করিলেন না, ইহা তাহার ইচ্ছাই ছিল। শ্যামাপদের মৃত্যুর পরে [illegible]

তিনি এক দিন তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন; আশুতোষ যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, স্থির হইল যে, প্রেমচাঁদের অংশের আর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি, অজয়কে দেওয়া হইবে। ইহাতে ফল এই দাঁড়াইল যে, অজয় সমগ্র সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ, আর শ্যামাচরণের দুই পুত্র, দুই-তৃতীয়াংশ পাইল। অজয়ের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ হইয়াছে, ইহা [illegible] শরতের কানে গেল। তিনি হাসিলেন। [illegible] এই কথা [illegible] বলিলেন।

প্রেমচাঁদের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহারা কলিকাতায় [illegible] শ্যামাচরণের দুই পুত্র এবং অজয়, ইহারাই এখন বাড়ীর [illegible] করিয়া থাকে এবং আশুতোষ, সুবদনা, [illegible] এবং তাঁহার স্ত্রী, ইঁহাদের সকলেরই বয়স হইয়াছে; শরতের জন্য তাঁহারা বড়ই চিন্তিত। শরৎ আর প্রত্যাগত হইলেন না। এখনও [illegible] বাটীতে গেলে শরতের [illegible] পাওয়া যায়।—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

